রবীন্দ্রনাথ
ও
বাংলার পল্লী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত

অশেষ প্রীতিভাজনেষু

৮ই শ্রাবণ, ১৩৭৮

লেখকের নিবেদন

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে মহাকবির স্থাপিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতামালার তৃতীয় বর্ষে রবীন্দ্রনাথের উপর কয়েকটি বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানান। নিমন্ত্রণ পেয়ে একই সঙ্গে সম্মানিত ও বিব্রত বোধ করলাম। আমি সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, সাহিত্য পাঠ করে থাকি। কিন্তু তা আলোচনার, বিশেষ করে সে আলোচনাকে বক্তৃতার আকারে প্রকাশ করার আমার সাধ্য ও অধিকার কতখানি!

তবু নিমন্ত্রণ সসম্মানে গ্রহণ করেছিলাম। নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে আমি বলতে গেলে, দেখিনি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। তাঁর নামে নামাঙ্কিত বক্তৃতার নিমন্ত্রণ তাই অবশ্য-কর্তব্যের মতই মনে হয়েছিল।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বভারতীতে পিতার নামে এই বক্তৃতামালার পত্তন করেছেন। শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম যৌবনে একবার সামান্য পরিচয় হয়েছিল। তারপর তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে সে দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে অবসর নিয়ে বিশ্বভারতীতে এসে বসবাস করছেন। তাঁর কৃত্যকে সম্মানিত করাও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সর্বোপরি মহাকবিকে তাঁর সাধনপীঠে প্রণাম জানাবার আবেগটিও অনুপস্থিত ছিল না। আর তা ছাড়া আমি তো সারাজীবনই বাংলার গ্রামের কথাই বলে এলাম!

সেই অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বভারতীতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতার দ্বিতীয় বর্ষে আমি 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' বিষয়ে চারটি বক্তৃতা দিই। দ্বিতীয় বর্ষের বক্তৃতা এখনও প্রদত্ত হয়নি।

শেষ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রশতবার্ষিকী বর্ষে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

মহাকবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই সব রচনা। সবগুলিকে একসঙ্গে সংকলিত করে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হল।

এর জন্য শিশু সাহিত্য সংসদ যে যত্ন নিয়েছেন তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

টালা পার্ক, কলিকাতা ২
শ্রাবণ, ১৩৭৮

প্রথম বক্তৃতা

প্রারম্ভিক নিবেদন

বিশ্বভারতীর এই অতি পবিত্র মৃত্তিকায় দাঁড়িয়ে কোন বাক্য উচ্চারণ করবার পূর্ব মুহূর্তে সর্বাগ্রে এই মৃত্তিকাকে, এই প্রতিষ্ঠানকে এবং এই তীর্থতুল্য স্থানের যিনি তীর্থ-দেবতাস্বরূপ, সেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি। এখানকার মৃত্তিকা একজন বাঙালী হিসাবে ও একজন লেখক হিসাবে আমার কাছে তীর্থভূমি। এই তীর্থভূমির ধূলো আমার ললাট ও চিত্ত রঞ্জিত করুক, আমাকে নম্র করুক।

আজ এই সভায় যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। যাঁরা জ্যেষ্ঠ ও অগ্রজ তাঁরা আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন ; যাঁরা অনুজ ও কনিষ্ঠ তাঁরা আমার সস্নেহ সমাদর গ্রহণ করুন। আপনাদের সকলকে এই তীর্থভূমিতে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা, নমস্কার, স্নেহ ও সমাদর জ্ঞাপন করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এই বক্তৃতামালা দেবার জন্য আমাকে আহ্বান জানিয়ে তাঁরা আমাকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছেন। এই কর্মের জন্য আমা অপেক্ষা বহু যোগ্য ব্যক্তি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের যে কোন একজন বহু গভীর চিন্তার ও জ্ঞানের বার্তা আপনাদের দিতে পারতেন, যাতে আপনারা লাভবান হতেন। আমি একজন কথাকার মাত্র। আমাদের চারিপাশে যে প্রভূত জ্ঞানের সম্ভার থরে থরে নানা গ্রন্থরাজির মধ্যে গ্রন্থিত ও সজ্জিত তা থেকে আমি জীবনে সামান্যই সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার যেটুকু জ্ঞান বা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা তার অধিকাংশই আমি অর্জন করেছি আমার সম্মুখে প্রবাহিত প্রত্যক্ষ জীবনের শোভাযাত্রা থেকে। সে শোভা-যাত্রায় রাজা ছিল না, ধনী ছিল না, ছিল সাধারণ মানুষ, এদেশের এখানকার এই অঞ্চলের মানুষ। এখানকার মানুষের দীনদরিদ্র, ক্ষীণকায়, রৌদ্রদগ্ধ, তাম্রবর্ণ দেহের মধ্যে যে বিচিত্র প্রাণলীলাকে তাদেরই জীবনের শরিক হয়ে প্রত্যক্ষ করেছি, মনে হয়েছে সেই বিচিত্র প্রাণশালা তার গূঢ় প্রকাশের ওপার থেকে যেন আরও কোন বাণী আকারে-ইংগিতে বার বার অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করবার চেষ্টা করছে। এইটুকুই আমার সম্বল। সে সম্বলটুকু আমি লাভ করেছি আমার চারিপাশের জীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে। তাই আমার বক্তব্যের মধ্যে যদি পরোক্ষ ও পঠিত জ্ঞানের স্বল্পতা লক্ষ্য করেন তবে মার্জনা করবেন। অবশ্য আমি এও জানি আমার কাছে সে ধরনের জ্ঞান ও উপলব্ধির কথা শুনবার জন্য আপনারা খুব ব্যগ্র ও উৎসুক নন।

এই বক্তৃতামালা যাঁর মহৎ নামে নামাঙ্কিত, সেই নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। এই খ্যাতিমান ও মহৎ মানুষটির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি, তবে আমার প্রথম যৌবনে ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁকে একবার দেখেছিলাম। সে দেখার স্মৃতি আজও মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে। কংগ্রেস অধিবেশনের সুসজ্জিত উজ্জ্বল মঞ্চে সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য ভাষণ দিতে উঠে তিনি শ্রোতার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে জয় করে চলে গেলেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী সহর্ষ

অভিনন্দনে দীর্ঘক্ষণ সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এর অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর সম্পর্কে আমার নাই। কিন্তু দেশসেবক, দেশের মুক্তি-সংগ্রামের যোদ্ধা, শিক্ষাবিদ্, আদর্শ-বাদী নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে, নেতা নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে জানি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাল্যাবধি তাঁর অকৃত্রিম অনুরক্তি ও গভীর শ্রদ্ধার কথা সর্বজনবিদিত। ১৯০২ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে, যখন নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বয়স সতেরো-আঠারোর বেশী নয়, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম নববিধান সমাজে দর্শন করেন। সেই প্রথম দর্শনের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। সেদিন তিনি 'ঊর্ধ্বলোকবাসী এক নির্মল ও স্বর্গীয় অস্তিত্বকে' নবীন কবির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন; এবং সেই প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা তাঁকে অভিভূত করেছিল। পরবর্তীকালে নৃপেন্দ্রচন্দ্র মহাকবির কাব্য, চিন্তা ও কর্মের মধ্যে নিজেকেই খুঁজে পেয়েছেন, এবং নিজেকে তারই সঙ্গে যুক্ত করে গিয়েছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে নামাঙ্কিত এই বক্তৃতামালা তার অন্যতম প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-সাহিত্য ও বিশ্বভারতীর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রেমকে এরই মাধ্যমে তিনি একটি স্থায়ী মূর্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর সেই আন্তরিক অভিপ্রায় ও প্রয়াসকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

এর পর কিছু ব্যক্তিগত কথা সসংকোচে উল্লেখ করব। আমার বক্তব্য পরিস্ফুটনের জন্যই সেগুলি উল্লেখের প্রয়োজন।

দেশ-বিদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যে সব মানুষের বিশ্বভারতীর সঙ্গে, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সম্পর্ক, যোগাযোগ ও যোগসূত্র আছে, বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তার থেকে বেশ খানিকটা পৃথক। তার কারণ, আমার জন্মস্থান শান্তিনিকেতন থেকে বিশ মাইলের মধ্যে, এই জেলাতেই। সেদিক থেকে শান্তিনিকেতন আমার জন্মস্থানের সমতুল্য। বাল্যকাল থেকেই নানান ভাবে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার পরিচয়। কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে এখানকার আনন্দে, উৎসবে, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেছি, এখানে এসে প্রথম যৌবনে ঋষিতুল্য পুরুষ দ্বিজেন্দ্রনাথকে, মহাত্মা গান্ধীকে দূর থেকে সবিস্ময়ে দর্শন করে গিয়েছি। শান্তিনিকেতন আমাদের অঞ্চলের অংশ বলে তরুণ বয়সে অহঙ্কারের অন্ত ছিল না। এখানকার নিভৃত, শান্ত অথচ নিত্যউৎসবময় পরিবেশে এমন কিছু ছিল যা শুধু এখানেই ছিল, আর কোথাও যার আস্বাদ মিলত না। মানুষের মন মায়ের কোলে, পিতৃগৃহে জন্মে আপনার ঘর খুঁজবার জন্য পথে বেরিয়ে কেবল খুঁজেই মরে, কিন্তু আপনার সেই ঘর যা নাকি তার মনের ঘর আর খুঁজেই পায় না। আমার সারাজীবন মাঝে-মাঝেই মনে হয়েছে, এখানকার পাখী-ডাকা নিভৃত গাছের ছায়ায়, আমার অতিপরিচিত কঙ্করময় মৃত্তিকার উপর যেন আমার সেই মনের ঘরখানি লুকিয়ে আছে। একটু খুঁজলেই যেন তার দেখা মিলবে। মোট কথা, বীরভূমের মানুষ হিসাবে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান আছে, যা যাবার নয়, যাকে তাড়াতে চাইলেও যাবে না।

আজ সর্বাগ্রে মনে পড়ছে লেখক হিসাবে যেদিন মহাকবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসি সেদিনের কথা। আজ যতদূর মনে পড়ে সে ১৯৩৭-৩৮ সালের কথা। আমার দুখানি বই, 'রাইকমল' আর 'ছলনাময়ী' মহাকবিকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বই দুখানি পড়ে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়ে পত্র লিখেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী এক চৈত্র মধ্যাহ্নে গেলাম কবিকে প্রণাম করতে। ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটে উঠল। তিনি বললেন—এ কি? তোমার মুখ তো আমার চেনা মুখ। কোথায় দেখেছি তোমাকে?

আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—কোথায় দেখেছি তোমাকে?

নিজেকে সংযত করে বললাম—আমার বাড়ি তো এ দেশেই। হয়তো বোলপুরে দেখে থাকবেন। বোলপুরে কয়েকবার দেখেছি আপনাকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

তিনি স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘাড় নেড়ে বললেন—না, না। তোমাকে যে আমি আমার সামনে বসে কথা বলতে দেখেছি মনে হচ্ছে।

মুহূর্তে একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। এই প্রথম সাক্ষাতের বৎসর কয়েক আগে ১৯৩৩ সালে সমাজ-সেবক কর্মীদের এক সম্মেলন হয়েছিল, তখন স্বর্গীয় কালীমোহন বাবুর উদ্যোগে কবি সমাজ-সেবক কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি ছিলাম কর্মীদের মুখপাত্র। আমিই কথা বলেছিলাম। কবি কি সেই কথা বলছেন? সেই অল্প-ক্ষণের স্মৃতি তাঁর মনে আছে?

আমি সসংকোচে সেই কথা নিবেদন করলাম।

তিনি বারকয়েক ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ। মনে পড়েছে, তুমিই ছিলে কর্মীদের মুখপাত্র। ঠিক আমার সামনে বসেছিলে তুমি।

তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তার সূত্রপাত হল এইভাবে।

কথায় কথায় বললেন—তুমি দেখেছ। আমি তো দেখবার সুযোগ পাই নি। তোমরা আমাকে দেখতে দাও নি।

আবার বললেন—দেখবে, দু চোখ ভরে দেখবে। দূরে দাঁড়িয়ে নয়। কাছে গিয়ে পাশে বসে তাদের একজন হয়ে যাবে। সে শক্তি এবং শিক্ষা তোমার আছে।

এবার আমি বললাম—পোস্টমাস্টারের পোস্টমাস্টার, রতন, ছুটির ফটিক, ছিদাম রুই, দুখীরাম রুই—এদের কথা।

—ওদের দেখেছি। পোস্টমাস্টারটি আমার বজরায় এসে বসে থাকত। ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে। ছিদামদের দেখেছি আমাদের কাছারীতে। ওই যারা কাছে এসেছে তাদের কতকটা দেখেছি, কতকটা বানিয়ে নিয়েছি।

এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। লেখক হিসাবে পরিচিত হতে এসে গ্রাম-সেবক ও সমাজ-কর্মীর পরিচয়টিকে এড়াতে পারি নি। দুই মিলে এক হয়ে গিয়েছে। তাই যখন এবার বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আমাকে 'নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা' দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন তখন থেকে এই সব কথাগুলি আমার মনের মধ্যে ভিড় করে রয়েছে। তা ছাড়া আমি নিজে পল্লীর মানুষ, সারাজীবন বাংলা দেশকে এই পল্লীর কথাই শুনিয়ে আসছি। আমার বলবার কথা যদি কিছু থাকে তো সে পল্লীর কথা। এই সব বিবেচনা করেই আমি আমার বক্তৃতার বিষয় স্থির করেছি—রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লীগ্রাম।

সর্বাগ্রে আমার নির্ধারিত বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলে নিতে চাই। আমার বক্তব্যের সীমা এবং সংজ্ঞা সম্পর্কেই আমার প্রথম বক্তৃতা অর্থাৎ এটুকু আমার মূল বক্তব্যের ভূমিকা।

ভূমিকা

কাল থেকে কালান্তরে প্রসারিত মানবসভ্যতায় মানুষের চিন্তা যেমন বহির্লোকে পৃথিবীর ধূলিজাল থেকে দূরান্ততম জ্যোতির্লোক পর্যন্ত প্রসারিত, তেমনি মনোলোকে তার চিন্তা জীবন জগতের কল্পনা, বাসনা সুন্দর-অসুন্দর মেধ্য-অমেধ্য সব কিছুকে স্পর্শ করে বোধ হয় আরও বেশীদূর প্রসারিত। এই দুয়ের সংঘর্ষ ও সংযোগ থেকে পাওয়া যে অভিজ্ঞতা, তার উপরই পৃথিবীর সব শিল্পের সৃষ্টি। ধাতুগত রুচি ও প্রবণতার সঙ্গে শিক্ষা যুক্ত হয়ে শিল্পীকে যে বিশেষ চরিত্র দান করে, সেই চরিত্রের প্রবণতা অনুযায়ী শিল্পী নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাকেই বিশেষ বিশেষ কালের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর আধারে পরিবেশন করেন। শিল্পসৃষ্টির জন্য আসল প্রয়োজন অভিজ্ঞতা, যার উপাদান হল মৌল জীবনবোধ। এই মৌল জীবনবোধ থেকে যিনি বিচ্ছিন্ন, এ বোধ যাঁর আয়ত্ত নয়, তিনি শিল্পের ছাপ দিয়ে নিজের কালে নিজের সৃষ্টির বিনিময়ে অজস্র বাহবা ও শিরোপা পেতে পারেন, কিন্তু তা পরবর্তী কালের কুঞ্চিত-ভ্রূ বিচারের ধোপে টিকবে না।

শিল্পীর রুচি ও প্রবণতার পার্থক্যহেতু শিল্পের রাজ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য। একই উপাদান নিয়ে দুই শিল্পী কাজ করেছেন এবং শিল্পকর্ম দুইই সমান রসোত্তীর্ণ হয়েছে, অথচ দেখা যাবে দুটি মূর্তি হয়তো সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। দুই বিপরীত মূর্তিতেই তারা শিল্প-বিচারে সমান সম্মান আদায় করবে, সমাদরের পার্থক্য ঘটলেও। সেক্ষেত্রেও সমাদরের কম বেশী ঘটতে পারে, তবে দুইকেই সমাদর করবার জন্য রসিক গ্রাহকের কোন দিন অভাব ঘটে না, ঘটবেও না। আমার কালের আমার সমসাময়িক দুই স্বর্গত বন্ধুর নাম এই প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করি। একজন বিভূতিভূষণ, অন্যজন মানিক। তাঁরা দুজনেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের অলংকার। দুজনেই জীবনের বহু মৌল বিষয় নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। অথচ দুজনের দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল তফাত। যদি একের দৃষ্টি ও সৃষ্টি অন্যের বিপরীত প্রান্তে বলি তা হলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। অথচ দুজনেরই পাঠকের কাছে সম্মান ও সমাদরের অভাব ঘটে নি।

আবার শিল্পীর এই রুচি ও প্রবণতাই তার সীমা ও গণ্ডি নির্দিষ্ট করে দেয়। এই রুচি ও প্রবণতা যেমন শিল্পীকে তার নিজস্ব দৃষ্টি, তার থেকে সঞ্জাত দর্শন, যা জীবনবোধের নির্যাস এবং সৃষ্টির উত্তাপ যোগায় তেমনি সে আপনার নিজস্ব বিশেষত্ব দিয়ে শিল্পীকে খণ্ডিতও করে। এর ফলশ্রুতি সাহিত্যের পাতায় পাতায়। তবে তার ফল সাহিত্যের পক্ষে অশুভ হয় নি। তাতে অভিনব বৈচিত্র্যের বিবিধ উপকরণে সাহিত্যের ভাণ্ডার উজ্জ্বলই হয়েছে। বৈচিত্র্যই নূতন মহার্ঘতার বোধ সংযুক্ত করেছে।

এরই ফলে, শিল্পের যে পরিধি পৃথিবীর ধূলিজাল থেকে ঊর্ধ্বলোকে জ্যোতিষ্কলোক পর্যন্ত প্রসারিত সেখানে সেই বিশাল রাজ্যে কোন শিল্পী শুধু ধুলোর মুঠো নিয়ে খেলা করেছেন, কেউ বা সেই ধুলোর উপরে বসে ধুলোর মুঠোর সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে মূর্তি গড়েছেন, কেউ বা ঘাসে মাঠে শিশুর মত ছুটে বেড়িয়েছেন, কেউ বা দূরে দাঁড়িয়ে জীবনের শোভাযাত্রা দেখেছেন, কেউ বা সেই শোভাযাত্রায় যাত্রীদলের একজন হয়েছেন, কেউ বা অন্ধকার অরণ্যভূমির অন্ধকার গায়ে কম্বলের মত জড়িয়ে নিয়ে অরণ্যভূমির শরিক হয়ে সেখানকার ভয়াল জীবনকে দেখেছেন, কেউ বা মাটিতে ধুলোয় দাঁড়িয়ে আকাশের উদাসীন মেঘকে উদাসীনের মতই দেখেছেন, কেউ বা আকাশলোকের অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে

তাকিয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছেন। এঁরা সবাই শিল্পী, সার্থক শিল্পী। এক-একজনের সৃষ্টিতে এক-এক আস্বাদ। নিজের নিজের সৃষ্টিলোকে তাঁরা সকলেই মহামান্য সম্রাট।

কিন্তু যে যাই দেখে থাকুন আর পরিবেশন করে থাকুন, একটি কৃত্য প্রত্যেকেই সম্পন্ন করেছেন সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে। এই রাজ্যের প্রতিটি মহিমান্বিত সম্রাটের অঙ্গে অঙ্গে পৃথিবীর ধুলার রাজলাঞ্ছন। এই রাজলাঞ্ছনের মহিমায় যিনি মহিমান্বিত নন, তিনি আমাদের, আমরা যারা ধুলোর উপর মাটি দিয়ে ঘর বাঁধি, যাদের চোখের জল মর্ত্যলোকের ধূলিই শোষণ করে, জীবনান্তে যাদের এই প্রাণময় রসময় দেহ আবার ধুলোতেই বিলীন হয়, সেই আমাদের রাজা নন। রাজা কেন, তাঁর বশ্যতা কেন, তাঁর সঙ্গে আমরা আত্মীয়তার সম্পর্কই স্বীকার করি না।

এখন প্রশ্ন উঠবে যে শিল্পের রাজ্যে এমন জন কেউ আছেন কি, থাকেন কি? উত্তরে অসংকোচে বলব, আছেন এবং তাঁদের সংখ্যা স্বল্প নয়। কেউ কেউ শিল্পী মন নিয়ে জন্মেও জন্মসূত্রেই এমন চারিত্রিক প্রবণতা নিয়ে এসেছেন যে পৃথিবীর ধুলোর ছোঁয়া তাঁদের অঙ্গে কেন, পায়েও লাগল না। মন তাঁদের আকাশের তারার সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে বাঁধা রইল। মনকে বাঁধতে বাঁধতে সারা দেহটাই যেন তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেই এই দেহে আকাশের মত, তারার মত হয়ে গেলেন। মর্ত্যলোকের দৈনন্দিন মানবজীবনের সুখ-দুঃখের সব আস্বাদ তাঁদের হারিয়ে গেল। সেই হারাবার তপস্যাই যেন তাঁদের সৃষ্টিতপস্যা। তাই শিল্পের আনন্দলোক থেকে তাঁরা স্বেচ্ছা-নির্বাসন বেছে নিয়ে অন্য আনন্দলোকে বসবাস করতে যান। তাঁদের গানে তাই মর্ত্যলোকের দুঃখ-বেদনার উষ্ণ স্পর্শ নাই, ক্লেশজয়ের মহিমার স্বাদ নাই। তাঁদের সংগীত মানব-সুখ-দুঃখ-বিরহিত আর এক আনন্দের শীতলতায় শীতল। তাঁরা আমাদের প্রণম্য। তাঁরা সাধক, তাঁরা পরম সত্যসন্ধানী। তবু বলি, তাঁরা শিল্পের রাজ্যের কেউ নন। তাঁদের প্রেম মিথ্যা হবে বলে 'ভুবনেশ্বর পথের ধুলায় নেমে আসন পাতেন না।

আর এক দল আছেন যাঁরা একদা এই ধুলায় মহিমান্বিত হবার জন্য এসে, কবে, নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো, ধুলো থেকে গা বাঁচিয়ে সরে এসে নির্জন, নিরাপদ, কোলাহলহীন গৃহশয্যা আশ্রয় করেছেন। সেইখানে বসেই তাঁর নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন শিল্পী-জীবন কেটে গেল। তাঁর গৃহকোণের শয্যাতল যত মহার্ঘই হোক, তিনি যে একদা ধুলো থেকে নিজেকে বাঁচাতে ঘরে ঢুকেছিলেন, তার ফলে শিল্পের রাজ্য থেকে যে বহিষ্কৃত ও নির্বাসিত হলেন এবং শিল্পের প্রাণদেবতা তাঁর বন্ধ দ্বারে বার বার করাঘাত করে স্বস্থানে ফিরে গেলেন সেকথা তিনি বুঝলেন না।

আরও একদল আছেন যাঁরা সারাজীবনে এই ধুলোর রাজ্যে প্রবেশাধিকারই পেলেন না। তাঁরা যেখানে চলাফেরা করলেন সেখানে যে ধুলোর নামগন্ধও নেই এ বোধটাই সারাজীবনে তাঁরা পেলেন না।

এই ধুলার রাজ্যের অধীশ্বর যাঁরা তাঁদেরও ইতর-বিশেষ আছে। এ রাজ্যে ধুলার রাজারা অধিকাংশই ধূলিতলবাসী। ধুলায় হাঁটতে হাঁটতে, চলতে চলতে, খেলতে খেলতে, দেখতে দেখতে অধিকাংশ জনই ভুলে যান তাঁর রাজ্যে ধুলো ছাড়া আরও কিছু আছে। ধুলার নিজস্ব মোহনতা, লোভনতাও তো কম নয়, অনেক! তার আস্বাদ যে বড় তীব্র, আর তাতে বৈচিত্র্যই বা কত! আবার কদাচিৎ এমনও দেখা যায় যে মর্ত্যলোকের ধুলার উপর পা রেখেও তিনি একবারও ভোলেন না যে তিনি মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকলেও তাঁর গন্তব্য ওই আকাশলোক, অসংখ্য জ্যোতিষ্কে গ্রথিত আকাশলোক। তাঁদের মনে এবং সৃষ্টিতে মর্ত্যলোকের মৃত্তিকা ও আকাশের নীলিমা এক অদৃশ্য স্বর্ণসূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। তাঁদের

সৃষ্টির টানায় মাটির ছোঁয়া, আর পোড়েনে আকাশের নীলের স্পর্শ। আকাশ আর মৃত্তিকার যুগল সম্মিলনে তাঁরা যে অতি-মহার্ঘ অতি-বিচিত্র অঙ্গদখানি রচনা করেন মানব-বিধাতা তা উত্তরীয়ের মত অঙ্গে ধারণ করে বোধ হয় কৃতার্থ হন এই ভেবে যে, যা দিয়ে তিনি তাদের মর্ত্যলোকে পাঠিয়েছিলেন তারই খানিকটা তারা ফিরিয়ে দিলে।

আমাদের মহাকবি এই পথের পথিক, এই ধারার শিল্পী। তিনি সাধক, তিনি সমাজ-সংস্কারক, তিনি দার্শনিক। কিন্তু এ সবই তাঁর খণ্ডিত পরিচয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি মহাকবি। এই ধূলি-ধূসর মর্ত্যজীবনে সকল ধূলি-মালিন্যের মধ্যে অবস্থান করে চিরদিন তিনি আকাশের স্বপ্ন দেখেছেন। তাই তাঁর রচনায় মাটি আর আকাশ মাখামাখি হয়ে আছে। তার মধ্যে আকাশের ছোঁয়া কতখানি আর কতখানি যে মাটির স্পর্শ তা নিরূপণ করা কঠিন। অধিকাংশ শিল্পী যেখানে শিল্পে মর্ত্যলোকের পর্ণকুটিরে অবস্থান করেন, সেখানে মহাকবির আবাসগৃহ মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আকাশলোকের একান্ত আস্বাদ গ্রহণ করবার সময় তিনি যে মর্ত্যলোকের মানুষ, মৃত্তিকা-সম্পর্ক-বিরহিত জন নহেন, এ সচেতনতা সব সময়েই ক্রিয়াশীল থাকত তাঁর মধ্যে। নিজের পা দুখানি যে এই মর্ত্যলোকের মৃত্তিকায় আরও লক্ষজন সমকালীন যাত্রীর সঙ্গেই ধূলার উপরেই স্থাপিত একথা বিস্মৃত হবার মত শিল্প-চারিত্র তাঁর নয়। কারণ মর্ত্যলোকের ধূলার মোহন মাধুরীই তাঁকে আকাশলোকের পথ চিনিয়েছিল। বহির্লোকে অনন্ত রূপরসময়ী, নিত্যউৎসবময়ী পৃথিবীর চিরনবীন অনন্ত সৌন্দর্য এবং অন্তর্লোকে মানবজীবনের অনিবার্য যাবতীয় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আকুতি-তপস্যা যুক্ত বেণীর প্রবাহের মত তাঁকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল সেই আশ্চর্য আকাশলোকে, যা পরিপূর্ণভাবে সৌন্দর্য-চেতনা ও আনন্দ-রসোপলব্ধিতে ভাস্বর। মর্ত্যদেহে মর্ত্যবস্তুনির্ভর এই সৌন্দর্য ও আনন্দ-আস্বাদের মধ্যে যে অমৃত আস্বাদ রয়েছে তাতে যদি স্বর্গ থাকে, দেবতা থাকে, তবে স্বর্গের দেবতারাও তার জন্য ঈর্ষিত হবে।

এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ লৌকিক ও জীবদেহসঞ্জাত হয়েও ভিন্ন শ্রেণীর। এর জাত আলাদা। জীবদেহে সঞ্জাত অন্যান্য বৃত্তির মত এর পরিপূর্তির জন্য বিশ্বসংসারের কোন কিছুর উপর এর কোন দাবী নাই। এ বৃত্তি দেহ দিয়ে কিছু পেয়ে নিজের পরিতৃপ্তি খোঁজে না। বিশ্ব-সংসারের দিকে চোখ মেললেই এর পরিতৃপ্তি। কবির সৌন্দর্য-চেতনা ও আনন্দরসোপলব্ধি যুগিয়েছে এই মাটির পৃথিবীই, অন্য কিছু নয়, অলৌকিক কিছু নয়, মাটির পৃথিবীর বাইরের কিছু নয়। এ সৃষ্টির এক প্রান্তে মাটির পৃথিবী, অন্য প্রান্তে তাঁর সৌন্দর্য-চেতনা। দুয়ের সম্মিলনে এর সৃষ্টি।

রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুরটিই বোধ হয় এই। দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত, প্রত্যক্ষ সৃষ্টির সৌন্দর্য-চেতনা এবং সেই চেতনার ফলশ্রুতিস্বরূপ এই সৃষ্টির ভঙ্গুর মৃৎপাত্রে তজ্জনিত আনন্দের অমৃতরসপান।

রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিমাণে যত বিপুল, প্রকারে তত বিচিত্র। কাজেই কোন একটি বক্তব্যকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সুর বলে উপস্থাপিত করতে চাইলে তা বিনা বিচারে সকলের পক্ষে গ্রহণ করতে অসুবিধা ঘটাই স্বাভাবিক। বিশালায়তন রবীন্দ্র-সাহিত্যে কত বিচিত্র, কত বিভিন্ন সুর! ঈশ্বর, প্রকৃতি, ধর্ম, স্বদেশ, সমাজ, বিশ্বমানবিকতা প্রভৃতি একজন স্পর্শকাতরচিত্ত, ধীমান, প্রবল কল্পনাশক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল পরিপক্ক মনুষ্যসত্তার পক্ষে যা যা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব, সর্ব বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেদোজ্জ্বলা বোধ দিয়ে চিন্তা করেছেন এবং নিজের প্রায়-অলৌকিক ও অতি চারু শিল্পশক্তির দ্বারা তাকে প্রকাশ করেছেন। কাজেই এই বহুবিচিত্র ও বহুবিভিন্নের মধ্যে একটি সুরকে প্রধান বলে চিহ্নিত করতে চাইলে তা সর্বজনসম্মতভাবে গৃহীত হতে আপত্তি হতে পারে।

রবীন্দ্র-মানস বিশ্লেষণ করলে হয়তো এর জবাব মিলতে পারে। মানুষ রবীন্দ্রনাথের মনোলোকের রুচি-প্রবৃত্তি ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যে আসল মানুষটি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তাকে চিনতে পারলে এর উত্তর পাওয়া সহজ হতে পারে। শিল্পকর্ম অবশ্যই শিল্পীর চিত্তের অন্তরঙ্গ পরিচয় বহন করে, কিন্তু সেই যে শতকরা একশো ভাগ তার অন্তরের আসল মূর্তি এ কথা কে জোর করে বলবে? সোনা থেকেই অলংকার তৈরী হয়; কিন্তু সোনা যখন অলংকারের মূর্তি নেয় তখন সোনা ছাড়াও তার সঙ্গে আরও কিছু কিছু সামান্য পরিমাণে মেশাতে হয়। অলংকার তৈরির প্রয়োজনেই সে মিশ্রণ প্রয়োজন হয়। তাই যেমন সোনা আর অলংকার শতকরা একশো ভাগ এক নয় তেমনি শিল্পের অভিজ্ঞতা আর শিল্পীর যে চিত্ত সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, দুইকে পুরোপুরি এক এবং অভিন্ন বলে ধরা ঠিক হবে না।

'ছিন্নপত্রাবলী'র মধ্যে কবি আপনার এই নিভৃত মনের অকপট পরিচয় অসংকোচে ব্যক্ত করেছেন। এরই সমর্থনে 'ছিন্নপত্রাবলী'র পত্রগুচ্ছের মধ্য থেকে কিছু অংশ এখন উদ্ধৃত করে শোনাচ্ছি:

> আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দূরে এনে একটি নিরিবিলি জায়গায় বেঁধেছি।...চারিদিকে কেবল মাঠ ধূ-ধূ করছে—মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের অবশিষ্ট হলদে বিচিলিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন। সমস্ত দিনের পর সূর্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলুম।...সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারিদিক কী যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বলব! বহু দূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল—নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল—মনে হল যেন ঐখেনে সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখেনে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর পরে বধূর মত কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গুন্‌গুন্ স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে—একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুজল নয়—একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মতো। এমন মনে করা যেতে পারে—মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপিলে এবং কোলাহল এবং ঘরকন্নার কাজ নিয়ে থাকে—যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ঔদাস্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে; সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি পৃথিবীর সেই অসীম ঔদাস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়ীতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করেছে, কারও ঘরের কথা নয়। ...আমার বাঁ পাশে ছোট্ট নদীটি দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে এঁকে-বেঁকে খুব অল্প দূরেই দৃষ্টিপথের বার হয়ে গেছে, জলে ঢেউয়ের রেখামাত্র ছিল না, কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমূর্ষু হাসির মতো খানিকক্ষণের জন্যে লেগে ছিল।
>
> [ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১০]

'ছিন্নপত্রাবলী'র মধ্যে এই ধরনের প্রকৃতি-সৌন্দর্য-আবিষ্ট চিন্তা ও ভাবের পরিমাণ বোধ হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই ধরনের চিন্তা ও ভাব 'ছিন্নপত্রাবলী'তে বহু বিবিধ চিন্তা ও ভাবের

অরণ্যমধ্যে সীতার ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত স্বর্ণালঙ্কারের মত যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। আমি উদ্ধৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করি নি, তবে যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছি তার আয়তন সংক্ষেপ করি নি। তার প্রথম কারণ ভাব ও চিন্তা এখানে গঙ্গার ধারার মত শিল্পবোধের দুই তটরেখা প্লাবিত করে অনিবার্য বেগে প্রবাহিত; এবং দ্বিতীয় কারণ এই প্রবল প্রবাহের তরঙ্গধ্বনি থেকে তার অন্তর্নিহিত ভাববস্তু একটি প্রগাঢ় ও সম্পূর্ণতা নিয়ে আমার শ্রোতাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

কবির অন্তরের যে ভাব-মূর্তি উপরে প্রকাশ পেয়েছে তাই বোধ হয় তাঁর একান্ত বাঞ্ছিত ও ঈপ্সিত মূর্তি, এই বোধ হয় তাঁর মূল চিত্তধর্ম। তাঁর দীর্ঘজীবনব্যাপী জীবনের প্রতি মুহূর্তের অচ্ছিন্ন সাধনা দ্বারা তিনি মানব-অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু গভীর, বহু বিচিত্র উপলব্ধি ও বোধের অতি মহার্ঘ সম্ভার সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু মনে হয়, তার সব কিছু এই মূল চিত্তধর্মের সঙ্গে মিশে তাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে, বিশিষ্টতা দিয়েছে; এই মূল চিত্তধর্মের চারিপাশে তাকে ঘিরে সেই উপলব্ধি ও ভাবের অলঙ্কারে সাজিয়েছে। এই মৃত্তিকাময়ী পৃথিবীর কোলে বসে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই অমৃত-মাধুরী পান ও সেই আনন্দ-আস্বাদের গানই তাঁর সারাজীবনব্যাপী কাব্য-সাধনার মূল কথা।

তাই এই মৃত্তিকাময়ী পৃথিবী থেকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সংসারের দিকে তাকিয়ে তাঁর কবি-দৃষ্টি কখনও ক্লান্ত হয় নি। বালক বয়সে চিত্তের উন্মেষের সময় থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত শ্যামা ধরিত্রী সমান নবীনা ছিল, তার রূপমাধুরী সমান অম্লান ছিল। এ সৌভাগ্য কদাচিৎ কোন কবি কেন, কোন মানুষেরই ভাগ্যে ঘটে না। এই জরা-মরণশীল মানবদেহ জন্মসূত্রেই যে আনন্দের ঐশ্বর্য নিয়ে জন্মায় তা কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়িত হয়; সংসারের জৈবদেহাশ্রয়ী প্রবৃত্তিগুলির পৌনঃপুনিক কর্ষণে সেই অকারণ আনন্দের উৎসের উপরে স্থূল থেকে স্থূলতর আবরণ পড়ে, মানুষের নিজের অজ্ঞাতে সে উৎসমূল থেকে ব্যক্তি-অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার সঙ্গে জীবদেহও কালের অমোঘ নিয়মে জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হয়। প্রাচীন, অস্বচ্ছ মন ও জীর্ণ দেহ আর আনন্দকে নবীন ও অম্লান করে ধরে রাখতে পারে না। তবে কেউ কেউ এই অমোঘ জীব-পরিণামের বিপরীতমুখী তপস্যায় ও চর্চায় নিজের জীর্ণ দেহেও নবীন প্রাণচেতনাকে ধারণ করে রাখতে পারেন। এই দুর্লভ শক্তি ও সাধনা মহাকবির ছিল। এবং তিনি এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রকৃতির রূপমাধুরী দর্শন-চর্চার মধ্যেই তিনি এই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

তবে মহাকবির এই মাধুরী দর্শনের এক আশ্চর্য বিশেষত্ব ছিল। যে বৃহৎ, নিঃশব্দ হাস্যময়ী পৃথিবী তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত ছিল তার সঙ্গে তাঁর বিশেষ চিত্তধর্ম এবং অভ্যাস যোগে সাধনার দ্বারা লব্ধ এক ধরনের বুঝাপড়া ছিল, যার ফলে দৈনন্দিন প্রাণযাত্রার কর্ম থেকে একবার বাইরে দৃষ্টি ফেরালেই তিনি বোধ হয় অনুভব করতেন, চিরনবীনা পৃথিবী অতি নিঃশব্দে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করে আছে অনন্ত সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে। মুগ্ধ দৃষ্টি বিনিময়মাত্রে তিনি সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর খোলা দরজা দিয়ে একেবারে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন। যে বিশেষকে দেখে তিনি মুগ্ধ হতেন সে বিশেষ,—সে সূর্যাস্তই হোক, সন্ধ্যা-সমাগমই হোক, তারাময় রাত্রিই হোক, নির্মলনীল আকাশই হোক বা পদ্মার ফেনশীর্ষ তরঙ্গই হোক—সে বিশ্বব্যাপী সুধারসসিক্ত অপার সৌন্দর্যের হাতছানির ইঙ্গিত মাত্র। সেই বিশেষ এক মুহূর্তে তাঁকে নির্বিশেষ সৌন্দর্যের জগতে উত্তরিত করত। এবং সেই বিশেষ যখন কাব্যের অভিজ্ঞতার আধারে আবার কাব্যের ভিতরে মূর্তি নিত, সে তখন বিশাল সৌন্দর্যের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর প্রকাশের মত দেখা দিত।

শুধু তাই নয়। জন্মসূত্রে যে ভগবদ্-বিশ্বাস তিনি লাভ করেছিলেন এবং যা তিনি তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও জীবনাচরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং নিজের অন্তরস্থ যে বোধকে উপনিষদের শিক্ষার মধ্যে নূতন করে লাভ করেছিলেন সেই বোধকেই প্রত্যক্ষভাবে তিনি সমস্ত সংসারব্যাপী স্পষ্ট অস্তিত্বরূপে উপলব্ধি করেছেন এই সৌন্দর্য আস্বাদের পথে। যিনি সংসারের সমস্ত অস্তিত্বের প্রাণের প্রাণ, যিনি বিশ্বসংসারের সমস্ত বিশেষ অস্তিত্বের মধ্যে সৌন্দর্যের অপার ভাণ্ডাররূপে মানব-অনুভবের মধ্যে প্রকাশিত, তিনিই সমস্ত অস্তিত্বের অন্তরালে প্রাণরূপে, জীবদেহে চেতনারূপে, মানবদেহে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত। কবির চিত্তে তিনিই অপার সৌন্দর্যানুভূতির মূর্তিতে প্রকাশিত। তাঁর অভ্যস্ত বিশ্বের সৌন্দর্যানুভূতির সাধনার পথেই তিনি একান্ত নম্রচিত্তে সেই সর্বব্যাপী অস্তিত্বকে বার বার আস্বাদ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন মানবচৈতন্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলের মূল্যে তার পদপ্রান্ত স্পর্শ করতে হয়। সেই সর্বব্যাপীকে, সুন্দর ও ভীষণকে জীবনের উপাস্য বলে জেনেছেন।

তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ ;
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি, তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্র সমীরে
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশের পরম ক্ষণে প্রিয়জনমুখে।...
... ... তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু আঁখি,
প্রতি দিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্বজনে ; তারপর দীর্ঘপথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে।

[এবার ফিরাও মোরে]

বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে মানবচৈতন্যের সৌন্দর্যকে মহাকবি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন। মানবচৈতন্যের এ সৌন্দর্যের প্রকাশ বীর্যবত্তার পথে, শ্রেয়কে লাভের জন্য দুঃখবরণের পথে। দুঃখের মূল্যেই তাকে স্পর্শ করা যায়।

বিশ্বসংসারের অনন্ত সৌন্দর্য, মানবচৈতন্যের চিরন্তন ভাস্বর মহিমা এবং সমস্ত জড় ও চৈতন্যের অন্তরালে সর্বব্যাপী এক অস্তিত্বের প্রতি নিঃশেষ আস্থা—এই তিনে মিলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুঙ্গশীর্ষ রচনা করেছে। সেখানে, সেই সৃষ্টি-অভিজ্ঞতার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি বা মানব-মহিমা বা সেই সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ও কবির ব্যক্তিসত্তা ছাড়া আর কিছু নাই, কেউ নাই।

কিন্তু আরও এক রবীন্দ্রনাথ আছেন। যে রবীন্দ্রনাথ আরও পাঁচজন মানুষের মত সমাজবদ্ধ হয়ে, মানুষের মধ্যে থেকে, দৈনন্দিন জীবন যাপন করেছেন। যিনি বিশুদ্ধ মানুষ ও বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের তপস্বী ছাড়াও যাঁর আরও এক লৌকিক পরিচয় আছে। যে লৌকিক পরিচয়ে তিনি আপনার সমসাময়িক পরিপার্শ্বের সঙ্গে নানান বন্ধনে আবদ্ধ এবং

নানান সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। যিনি প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের ঢেউয়ে ডুবেছেন ও ভেসেছেন, যিনি সমসাময়িক ঘটনার আবর্তে পড়েছেন ও অংশ নিয়েছেন, যিনি সমসাময়িক কালে আশপাশের মানুষের সঙ্গে নানান সম্পর্কে বাঁধা পড়েছেন! এ মানুষ অনেক পরিমাণে লৌকিক মানুষ।

এখানে সুমহৎ কবি-কল্পনা থেকে ভিন্ন স্তরে তিনি বিচরণ করেন। এখানে লৌকিক বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে ক্রিয়াশীল। এখানে তাঁর সামনে লৌকিক সংসার আপনার বিশেষ বিশেষ দাবী বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে উপস্থিত।

'ছিন্নপত্রাবলী' থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

> কাল যখন কাছারি করছি, গুটি পাঁচ ছেলে হঠাৎ অত্যন্ত সংযতভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে—কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না করতে একেবারে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আরম্ভ করে দিলে, 'পিতঃ, অভাগ্য সন্তানগণের সৌভাগ্যবশতঃ জগদীশ্বরের কৃপায় হুজুরের পুনর্বার এতদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছে।' এমনি করে আধ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করে গেল; মাঝে মাঝে মুখস্থ বক্তৃতা ভুলে যাচ্ছিল, আবার আকাশের দিকে চেয়ে সংশোধন করে নিচ্ছিল। বিষয়টা হচ্ছে তাদের স্কুলে টুল এবং বেঞ্চির অপ্রতুল হয়েছে—···ছোট্ট ছেলের মুখে হঠাৎ এই অনর্গল বক্তৃতা শুনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল! বিশেষতঃ এই জমিদারি কাছারিতে, যেখানে অশিক্ষিত চাষারা নিতান্ত গ্রাম্যভাষায় আপনাদের যথার্থ দারিদ্র্যদুঃখ জানায়—যেখানে অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষে গোরু বাছুর হাল লাঙল বিক্রি করেও উদরান্নের অনটনের কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে 'অহরহ' শব্দের পরিবর্তে 'রহরহ', 'অমিক্রমের' স্থলে 'অতিক্রয়' ব্যবহার, সেখানে টুল-বেঞ্চির অভাবে সংস্কৃত বক্তৃতা কানে এমনি অদ্ভুত শোনায়। [ছিন্নপত্রাবলী: পত্রসংখ্যা ১২]

এর সঙ্গে 'এবার ফিরাও মোরে' নামক অতিখ্যাত কবিতার আর একটি একান্ত পরিচিত অংশ উদ্ধৃত করছি:

> ·····ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
> মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
> বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
> বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
> তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
> নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
> মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান
> শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
> রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে
> সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে
> নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
> দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
> মরে সে নীরবে।

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে এ বোধ নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে যে, এ আর এক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যানুভূতি, মানব-মাহাত্ম্যের ও সর্বব্যাপী এক অজ্ঞেয় অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধির মিশ্রণে গঠিত মরমী কবির দৃষ্টি এখানে অনুপস্থিত। এ জীবন, এ দৃষ্টি, এ অভিজ্ঞতা বুদ্ধিগ্রাহ্য; এসব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের কম-বেশী পরিচয়

সকলেরই আছে। আমাদের সমসাময়িক কালের স্বর্গত কবি-বন্ধু সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ' নামে যে বিখ্যাত কবিতাটি আছে তার থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলেই এ বিষয়ে আমার বক্তব্য স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ হবে বলে মনে করি।

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
নিজ সাধনায় প্রান্তর ত্যজি চুম্বিয়া নীলাকাশ
অসীম শূন্য হিমে ঢাকি শির একেলা প্রহর যাপে,
রৌদ্র-আলোকে তুষার-শিখর সাদা ধবধব করে—
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।
... ...
হতাশ হইয়া বসেছি আমার গৃহ-অঙ্গন-ছায়ে—
সুমুখে আমার সবজির ক্ষেত তাহারি আড়াল দিয়া
হিমালয় হতে ঝরণা নামিয়া উপল-চপল পায়ে
ঝিরিঝিরি আর কুলু কুলু রবে ছুটেছে গ্রামের মেয়ে।

[রবীন্দ্রনাথ ঃ রাজহংস ঃ সজনীকান্ত দাস]

মরমী মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁর গৌরব হিমালয়ের হিমশৃঙ্গের তুল্য, তাঁকে আমার বিষয় থেকে সরিয়ে রাখলাম। যিনি আমার জীবন-ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে গ্রামের নদীটির মত বহমান তিনিই আমার আলোচনার বিষয়। তাও আমি তাঁর মাত্র একটি অংশ বেছে নিয়েছি। যে রবীন্দ্রনাথ পল্লী বাংলার মানুষ ছিলেন, পল্লী বাংলার মানুষের কথা, সমাজের কথা, প্রকৃতির কথা ভেবেছেন, বর্তমান বক্তৃতামালায় তিনিই আমার আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী এই বিষয়েই আমি তিনটি বক্তৃতা করব। বক্তৃতার বিষয়গুলি হল—রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীবাসী, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসমাজ, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীপ্রকৃতি।

আমার আজকের বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। শেষ করার পূর্বে এ কথা বলি যে আমি যে দুই রবীন্দ্রনাথের দুই মূর্তি এখানে আলোচনার মধ্যে উপস্থাপন করেছি তাঁরা একই ব্যক্তি, আদৌ ভিন্ন নহেন। একই মূর্তির দুই প্রকাশ মাত্র।

আপনি, যিনি শেষরাত্রে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করে এসে শান্তিনিকেতনের মৃত্তিকায় আপনার গৃহাঙ্গনের পাশে বড় ছায়াচ্ছন্ন গাছটির তলায় দাঁড়িয়ে গাছটির ঊর্ধ্বলোকে প্রসারিত শাখা-বাহুর অবকাশে শান্ত ও নম্র চিত্তে পূর্বাচলশায়ী শুকতারাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন নিঃসীম নির্জনতা ও অপরিমেয় নিস্তব্ধতার পটভূমিতে, তিনিই তো আবার দুঘণ্টা পরে কলকাতা-প্রত্যাগত বন্ধুকে কলকণ্ঠে প্রভাতী চায়ের টেবিলে অভ্যর্থনা জানান! তাতে তো আপনার শেষরাত্রির সেই নির্জন ও গোপন নম্র সাক্ষাৎকার মিথ্যা হয়ে যায় না.!

এখানকার মাটিতে এসে দাঁড়ালে, এখানকার আকাশে-বাতাসে-মৃত্তিকায় সেই আশ্চর্য সুমহৎ সাধনাকেও যেমন আপনার অজ্ঞাতেই আমি স্পর্শ করি তেমনি এই অঞ্চলের মানুষ বলে, এ কথা কখনও ভুলতে পারি না যে মহাকবি আমাদেরই মৃত্তিকায় এপাশে জয়দেব ওপাশে চণ্ডীদাসকে রেখে তাঁর সাধনার আসন পেতেছিলেন। এবং তাঁর বৃহৎ সাধনার মধ্যে পল্লীর মানুষের সুখদুঃখও একটি বিশেষ স্থান জুড়ে ছিল। সেই কারণেই আমার এই বিষয় নির্বাচন। এই মাটির মানুষ হয়ে আমি সে কথা ভুলি কি করে?

দ্বিতীয় বক্তৃতা

রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীর মানুষ

এক

আমি আমার মূল বক্তব্যে এসে পৌঁছেছি।

আমার আলোচনায় একান্ত পরিচিত ভূমিতে উপস্থিত হয়ে বিশেষ স্বস্তিবোধ করছি। কাল থেকে কালান্তরে প্রসারিত আমাদের এই বৃহৎ প্রাচীন দেশের মৃত্তিকার ও তার জনারণ্যের মানসভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন চিন্তা-মননের আকাশলোক থেকে অপেক্ষাকৃত বাস্তবভূমিতে ধরিত্রীবক্ষে এসে দাঁড়িয়েছি। নাগরিক সভ্যতার বাইরে প্রসারিত দেশের অগণিত পল্লীর মধ্যে যে জীবন, মহাকবি তাকে কেমনভাবে দেখেছিলেন তাই আমার আলোচ্য বিষয়।

বলা বাহুল্য, আমার বিচার তাঁর এই সম্পর্কিত সাহিত্যের শিল্পমূল্যের বিচার নয়। বাংলার পল্লী-জীবন সম্পর্কে, সেখানকার মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যা ভেবেছিলেন, তাকে যেমনভাবে দেখেছিলেন তাই আমার আলোচনার বিষয়।

আমার পূর্বদিনের আলোচনার শেষাংশে আমি উল্লেখ করেছিলাম—মহাকবির যে কোনো রচনা বা অভিজ্ঞতা, তা যত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই বিধৃত হোক বা যত সামান্যই হোক, বা কোন বিশেষ বা বিশিষ্ট ঘটনা-কেন্দ্রিক হলেও, তা প্রায় সব সময়েই মানব-অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে এক স্থির ধ্রুববোধের স্পর্শ বহন করে, এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে গেলে তাকে তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী অচ্ছিন্ন তপস্যায় অর্জিত সেই বৃহৎ ও স্থির উপলব্ধির আলোকের সম্মুখে স্থাপন করে দেখতে হবে।

নিজের মানসিক পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—

…আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।

মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধ-শ্যাম মাতৃমুখ-পানে
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলি মাটি তোর।

আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

[আত্মপরিচয়]

'গোরা'র শেষ অংশে গোরা উচ্চারণ করেছে ঃ

> আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নাই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।…আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আর আমার অপবিত্রতার ভয় রইল না। পরেশবাবু, আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপর ভূমিষ্ঠ হয়েছি—মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

আমার বার বার মনে হয়েছে, গোরার উচ্চারিত এই কথাগুলি শুধুমাত্র 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক গোরার কথাই নয়, এগুলি কবি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথেরও অন্তরের

কথা। ভারতবর্ষ সম্পর্কে, বিস্তীর্ণ মৃত্তিকা ও অগণিত মানুষ সমন্বিত যে ভারতবর্ষ, তার সম্পর্কে তিনি এই মনোভাবই পোষণ করতেন। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা তাঁর কাছেও মাতৃক্রোড়, এবং ভারতবর্ষের বিশাল জনতার প্রতিটি মানুষ তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরতুল্য।

এই আলোচনায় এইটি আমার কাছে মূল সূত্রের মত। তবে এখানে কয়েকটি কথা সবিনয়ে উল্লেখ করি। আমি মহাকবির রচনা থেকে এই অংশটুকু আবিষ্কার করে নিয়ে তাকেই তত্ত্বের আকারে উপস্থাপিত করে মহাকবির এই সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও ভাবনাকে এই তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি নি। এই বক্তৃতার প্রয়োজনে রবীন্দ্র-রচনাবলী নাড়াচাড়া করতে করতে যে সমস্ত বিষয়বস্তু আলোচনার সামগ্রী হিসাবে সংগৃহীত হল, তারই মধ্য থেকে এই ধরনের একটি মনোভাব আমার কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এবং তাঁর রচনা থেকে পূর্বে উদ্ধৃত বক্তব্যটুকু পেয়ে মনে হল যেন এই মনোভাবই এখানে বাণী হয়ে ধরা দিয়েছে।

দুই

একান্ত পরিণত বয়সে তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ঐকতান'-এর মধ্যে উচ্চারণ করেছিলেন :

সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে ;
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার ;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতিক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে ;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

উদ্ধৃত চরণগুলির মধ্যে মহাকবির উক্তিতে যে আকুতি, নম্রতা ও প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ আছে তা যেমন আন্তরিক তেমনি তীব্র ও অকপট। পরিণত বয়সের এই আক্ষেপ, আমার মনে হয়, তাঁর প্রথম জীবনেও সমান তীব্র ছিল। দেশের আপামর জনসাধারণের অতি বৃহৎ জীবনযাত্রা থেকে ভবিতব্যবশে লৌকিকভাবে তিনি দূরেই ছিলেন। কিন্তু মনে দূরে ছিলেন না। এবং তা ছিলেন না বলেই কাছে আসার, মাতৃক্রোড়ে আপামর সাধারণ স্বদেশবাসী ভাইদের পাশে বসার ইচ্ছা তীব্রতর মূর্তিতে আজীবন তাঁর হৃদয়ে লালিত ছিল। এর ফল অশুভ হয় নি। তাঁর অন্তরের এই সুতীব্র পিপাসা তাই সদাজাগ্রত থাকত, এবং মানসিক ভাবে তাঁকে দীনতম স্বদেশবাসীর সঙ্গে যুক্ত করে রাখত। এ কথা সত্য যে, তাদের জানার তীব্র পিপাসা তাঁর জীবনে কোন দিন ম্লান হয় নি। আবার এও সমান সত্য যে দূর থেকে

দেখার জন্য দেখায় তীব্র স্পষ্টতা আসে নি। আবার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ও সহজ হলে এক ধরনের অবহেলা-জনিত অস্বচ্ছতার জন্ম হয়, যার ফলে একান্ত কাছের মানুষের বিশিষ্টতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁর ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন আসে না। দূরে থেকে তিনি যতটুকু দেখেছেন, তার সঙ্গে সেই দেখার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে তাঁর মন ও ধ্যান সদা-সতর্ক ও সদা-সচেতন ছিল। এবং তাঁর কবি-মন তাকে পরিপূর্ণ মূর্তিতে লাভ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আপনার কল্পনার মধ্যে প্রায় অহরহই তাকে ধ্যান করেছে। এবং তাঁর তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি তাকে এক বিশিষ্ট পরিপূর্ণতা দান করেছে। তাই তাঁর রচিত মানবমূর্তিতে অস্পষ্টতার ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু এই ত্রুটিই আবার তাতে অবশ্যম্ভাবী এক পরিপূর্ণতাও যুক্ত করেছে। তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিক ভিন্নতর হলে হয়তো মানবমূর্তির স্পষ্টতর রূপ পেতাম, কিন্তু তাতে চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে হারাবার আশঙ্কা ছিল।

তাঁর কবিচিত্ত ও শিল্পীসত্তা এই অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই অন্তরে অন্তরে আপনার দুর্লঙ্ঘ্য খামতি পূরণের জন্য সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকত। সেই কারণেই দূরস্থ বিপুল দেশবাসীর জীবনকে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেছেন। এবং সে দেখায় ক্ষান্তি ছিল না। তার প্রমাণ তাঁর বিপুল রচনার মধ্যে অসংখ্য স্থানে ছড়িয়ে আছে। দূরে বাস করেও, দূরস্থ মঙ্গলাভিলাষী, উৎকণ্ঠ আত্মীয়ের মত তিনি তাদের সব দোষ ও সব গুণের সংবাদ জানতেন, গুণগুলির সম্পর্কে তাঁর তৃপ্তির ও গর্বের শেষ ছিল না, আবার দোষগুলিও পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে লক্ষ্য করে মমতাময় শুভ বচনের দ্বারা, কখনও কখনও ক্ষুব্ধ তীব্রতার সঙ্গে তিরস্কার করে বিদূরিত করতে চেয়েছেন। দূরের, একান্ত দূরের স্বদেশবাসীকে যে তিনি তাদের কাছের, একান্ত ঘনিষ্ঠ, অস্বচ্ছদৃষ্টি আত্মীয়ের চেয়ে বেশী চিনতেন নীচের উদ্ধৃতিটি থেকে তা অনায়াসে বুঝা যাবে ঃ

> বিনয় কহিল,……আমরা শেয়ালদা ছাড়তেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। সোদপুর স্টেশনে যখন গাড়ী থামল দেখি, একটি সাহেবী-কাপড়-পরা বাঙালি নিজে মাথায় দিব্যি ছাতা দিয়ে তার স্ত্রীকে গাড়ী থেকে নাবালে। স্ত্রীর কোলে একটি শিশু ছেলে; গায়ের মোটা চাদরটা দিয়ে সেই ছেলেটিকে কোনোমতে ঢেকে খোলা স্টেশনের এক ধারে দাঁড়িয়ে সে বেচারী শীতে ও লজ্জায় জড়সড় হয়ে ভিজতে লাগল—তার স্বামী জিনিসপত্র নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁকডাক বাধিয়ে দিলে। আমার এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, সমস্ত বাংলা দেশে কি রৌদ্রে কি বৃষ্টিতে কি ভদ্র কি অভদ্র কোনো স্ত্রীলোকের মাথায় ছাতা নেই! যখন দেখলুম, স্বামীটা নির্লজ্জভাবে মাথায় ছাতা দিয়েছে, আর তার স্ত্রী গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে নীরবে ভিজছে, এই ব্যবহারটাকে মনে মনেও নিন্দা করছে না এবং স্টেশনশুদ্ধ কোনো লোকের মনে এটা কিছুমাত্র অন্যায় বলে বোধ হচ্ছে না, তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—আমরা স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত সমাদর করি—তাদের লক্ষ্মী বলে, দেবী বলে জানি এ সমস্ত অলীক কাব্যকথা আর কোনো দিন মুখেও উচ্চারণ করব না। আমরা দেশকে বলি মাতৃভূমি, কিন্তু দেশের সেই নারীমূর্তির মহিমা দেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ না করি—বুদ্ধিতে, শক্তিতে, কর্তব্যবোধের ঔদার্যে আমাদের মেয়েদের যদি পূর্ণ পরিণত সতেজ সবল ভাবে না দেখি—ঘরের মধ্যে দুর্বলতা সংকীর্ণতা এবং অপরিণতি যদি দেখতে পাই—তা হলে কখনোই দেশের উপলব্ধি আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না।

অতি পরিচিত, অতি তুচ্ছ, অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি স্পষ্ট ও সহজ একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিল্পী এখানে প্রচলিত দেশাচার ও অভ্যাসের মূর্তিটি তুলে ধরে তার মধ্যে যে অন্ধ অবহেলা, অসৌজন্য ও হৃদয়হীনতার প্রকাশ আছে তাকেই ব্যক্ত করেছেন। আমাদের দেশে নারীর সম্মান সম্পর্কে শাস্ত্রে অনেক উৎকৃষ্ট বাক্য আছে ; একদিন হয়তো তার সত্যমূর্তিও সমাজের মধ্যে ছিল সামাজিক আচার, ব্যবহার ও অভ্যাসের মধ্যে, কিন্তু আজ তার বিপরীত মূর্তিই প্রকাশিত। এখানে লক্ষণীয় যে শিল্পী এখানে বিনয়ের মুখ দিয়ে কোন তিরস্কার বা ধিক্কার উচ্চারণ করেন নি, কেবল হৃদয়ের গভীর ক্ষোভ ও বেদনাই প্রকাশ করেছেন।

স্বদেশের মানুষের মূর্তি আঁকতে গিয়ে সেই মূর্তিটিকে হৃদয়ের যে পটভূমিতে স্থাপন করে তাকে রচনা করতেন সেই পটভূমি যে যে ভাবে ও রসে রঞ্জিত ও সরস ছিল তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। স্বদেশ সেখানে এই সাবিত্রী নারায়ণী ধরিত্রীর অংশ, তিনি জননীস্বরূপা, স্বদেশের মৃত্তিকা মাতৃক্রোড়, স্বদেশবাসী আপামর সাধারণ মানুষ তাদের সব দোষ-গুণ ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে কনিষ্ঠ সহোদরতুল্য। তাই মানুষের মূর্তি রচনার সময় স্বাভাবিকভাবে চিত্ত ও বুদ্ধি সহযোগে গঠিত মূর্তি নির্মাণশালার ভাবে ও রসে মাখামাখি হয়ে যেত।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে একজন মহৎ শিল্পীর উল্লেখ করি। টলস্টয়। সমগ্র জীবন ধরে নিজের অন্তর্জীবনে জীবনকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য অন্তর্জীবনে তাঁর সংগ্রামের আর শেষ ছিল না। নিজের চিত্তভূমিতে সেই ক্ষমাহীন সংগ্রামের পটভূমিকায় যে যে মানবমূর্তি তিনি গড়েছিলেন তারাও সেই সংগ্রামের সুমহৎ লাঞ্ছন বহন করছে। এইখানে আমাদের মহাকবির সঙ্গে তাঁর শিল্পচারিত্রের কিছু সাযুজ্য আছে।

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে এখানে শিল্প-সাধনাই একমাত্র সাধ্য বিষয় নয়। শিল্প-সাধনার সঙ্গে জীবন-সাধনা এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে ও অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। সামগ্রিক জীবন-লাভের প্রাত্যহিক তপস্যা এই ভাব ও রসের পটভূমিটি গঠন করে দিয়েছিল। এখানে শিল্পের ফলশ্রুতি হিসাবে আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হয়ে কল্যাণও যজ্ঞাগ্নিসম্ভূত যুগল সন্তানের মত হাত-ধরাধরি করে উপস্থিত।

সাধারণ শিল্পীর ক্ষেত্রে শিল্পের ফলশ্রুতি হিসাবে থাকে শুধুমাত্র আনন্দ। সেখানে মানব-জীবন-রহস্যের তীব্র আস্বাদ থেকে যে আনন্দের জন্ম হয় তা বৃহৎ অর্থে মানবিক কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে সম্পর্ক-নিরপেক্ষ। সেই যথেষ্ট। কখনও কখনও আকস্মিকভাবে সেই আনন্দ ভোগের সঙ্গে এই মানবিক কল্যাণ-স্পর্শেরও আভাস যুক্ত হয়, যা পাঠকের চিত্তে আনন্দ-সরসতার সঙ্গে একটি সকরুণ বিনম্রতার ও তৃপ্তির আস্বাদ যুক্ত করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দুই প্রায় অনিবার্য যোগে যুক্ত। এর কারণ তাঁর সদাসতর্ক প্রাত্যহিক জীবন-সাধনা তাঁর শিল্প-সাধনায় এক গভীরতর ভিন্ন অর্থ যুক্ত করে তাঁর শিল্পকে এক বৃহত্তর ও মহত্তর অর্থে গৌরবান্বিত করেছে।

তিন

তাঁর জীবনে ন' দশটি বৎসর পল্লীর পরিবেশ ও পল্লীর মানুষ যেন একান্ত নিবিড় ভাবে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল। সময়টা মোটামুটি ১২৯৮ সাল থেকে ১৩০৭ সাল। এই কালের রচনার একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে 'ছিন্নপত্রাবলী' ও 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম দিকের অধিকাংশ গল্প, যার সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী।

তাঁর জীবনের এই নয় দশ বৎসর কাল প্রধানত কেটেছিল পাললমৃত্তিকাগঠিত, নদীমাতৃক বাংলা দেশের গভীর অন্তঃপুরে, একেবারে নদীর বুকের উপর। তাঁর এ সময়কার সৃষ্টির

প্রকৃতি দেখে মনে হয় বাংলা দেশের সঙ্গে তাঁর এক নিবিড়, অন্তরঙ্গ, দীর্ঘস্থায়ী পরিচয় ঘটেছিল এই সময়। এ সময়ের রচনা থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসাব করলে অবশ্যই জানা যাবে যে এই বসবাস দীর্ঘস্থায়ী হলেও অবশ্যই ছেদহীন নয়। এই কালের মধ্যে তিনি অবশ্যই বহুবার রাজধানীতে ও নগরজীবনে ফিরে এসেছেন, আবার ফিরে গিয়েছেন পদ্মার উপরে। তবু বলব, এই কালে তিনি সেখান থেকে সরে এলেও সদাসর্বদা বাংলাদেশের অন্তঃপুরের নিবিড় আস্বাদে নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন। তাই মনে হয়, যেন তিনি এই কালে দেশজননীর গর্ভস্থ ভ্রূণের মত ক্রমাগত নিজের সমস্ত সত্তা পরিপূর্ণ করে সেই জননীর প্রাণরস থেকে প্রাণরস পান করেই নিজের শিল্প-জীবন ও শিল্প-চেতনাকে পুষ্ট ও পূর্ণ করে তুলেছিলেন।

এই সময়ে চার পাঁচ মাস মাত্র ব্যবধানে লিখিত দুখানি চিঠি তাঁর এ কালের প্রত্যক্ষ মনোভাব ও অভিজ্ঞতা হিসাবে দাখিল করছি :

এক ॥

> এ দেশে (ইংল্যান্ড) এসে সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। এ দেশের মতো তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালবাসে। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না—আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মত আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাইনে।
>
> [ছিন্নপত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৭]

দুই ॥

> ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি—ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতা-ময়, এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা, অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত? আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই-সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগারা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালোবাসি। এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে। এই জন্য স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশী ভালবাসি—এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সবদা চিন্তাকাতর বলেই।……
>
> [ছিন্নপত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ১৩]

যে শিল্পী গল্পগুচ্ছের এই পল্লীপ্রাণ গল্পগুলি রচনা করেছেন তাঁর মনোভাব এখানে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত। মানস-মৃত্তিকা আপনার সমস্ত উর্বরতা ও সরসতা নিয়ে অপেক্ষা করছিল, তাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটি ক্ষুদ্র বীজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গল্পের মঞ্জরী হয়ে এই মৃত্তিকা থেকে উদ্গত হয়েছে। জমিদারী কাছারীতে দেনা-পাওনার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমলাদের সঙ্গে নিকট-দূরত্ব থেকে অথবা বোটের উপর থেকে রচনা, চিন্তা বা শুধু দেখার মধ্য দিয়ে সুদূর বৃহৎ চলমান জীবনের ভগ্নাংশ টুকরো টুকরো চোখে, কানে এবং সেই সঙ্গে অব্যর্থভাবে তৃষিত মনে ধরা পড়ে গিয়েছে। তাই থেকে পরম যত্নে কল্পনার সযত্ন লালনে তাকে শিল্পী পরিপূর্ণ করে তুলেছেন।

এ কাজ যখন তাঁর মনোলোকে ও তার ফলশ্রুতি হিসাবে গল্পের আকারে মূর্তিলাভ করছিল তখন বাংলাদেশের সাহিত্যের আসর সুদূর রাজপুতানার রাজকীয় গল্পে জমজমাট। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে, তখন তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৩; দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল যৎসামান্য বর্ধিত কলেবরে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০ মাত্র। কিন্তু 'রাজসিংহে'র যে আধুনিক মূর্তি তা তার হল ১৮৯৩ অর্থাৎ বাংলা ১২৯৯ সালে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হবার সময়। প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে ৪৩৪ পৃষ্ঠা কলেবরে রসের ও কল্পনার পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে সে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে জনচিত্ত জয় করে নিলে। রস ও রুচির এই সংস্কারের কালে বাংলাদেশের সামান্য মানুষদের প্রাত্যহিক পরিচয়ের স্পর্শে লুপ্ত-রহস্য আকর্ষণহীন, নিরাভরণ, দরিদ্র জীবনের উপকরণ নিয়ে গল্প রচনা করা কোন ক্রমেই সহজ ছিল না।

এ কথা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রচার করা নয়, উদ্দেশ্য হল তাঁর এই অভিজ্ঞতার নিবিড়তা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে কিছু বলা। যে হৃদয় ও মস্তিষ্ক স্বদেশকে মাতৃক্রোড় ও স্বদেশবাসীকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে তার একান্ত সন্নিকটে ও সান্নিধ্যে আসবার তৃষ্ণায় উন্মুখ, সেই হৃদয় ও মস্তিষ্ক যখন সেই পরম বাঞ্ছিত নিবিড় সান্নিধ্যলাভ করবার বৃহৎ সৌভাগ্য লাভ করল, তখন সেই ভাব ও কল্পনা অনিবার্য বন্যাবেগের মত সাহিত্যের অঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখানে কোন দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশই ছিল না; সে ভাব ও কল্পনা পরিপূর্ণ রসমূর্তি গ্রহণ করে পাঠককে পরিতৃপ্ত করতে পারবে কি না—একথাও বোধ হয় একবারও গল্পকারের চিত্তকে আন্দোলিত করে নি। এ তো শুধু শিল্পের চর্চা ও প্রকাশ নয়, এ এক মানবজন্মের সামগ্রিক আকুতি ও তৃষ্ণা-পরিপূর্তির পরিপূর্ণ ও শিল্পময় প্রকাশ।

চার

এই কারণেই তিনি বহু খ্যাতিমান, সার্থক শিল্পীর মত মানুষকে শুধু মাত্র একক মানুষ হিসাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি, দেখতে পারেন নি। স্বদেশের অগণিত সাধারণ মানুষ স্বদেশের মৃত্তিকায়, স্বদেশের যুগ যুগ বাহিত আচার সংস্কার রুচি দ্বারা অভ্যস্ত হয়ে যে মূর্তি নিয়েছে, তারাই তাদের সবটা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁর গল্পে এসে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই তাঁর গল্পে আত্মমগ্ন বিচ্ছিন্ন মানুষ তাদের কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিছক নির্ভেজাল জৈব প্রবৃত্তির পথে প্রকাশিত মূর্তি নিয়ে আসে নি; তারা ফুটে উঠেছে সমাজের ও পরিবারের পটভূমিকায়, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের বোঝাপড়া করে মানিয়ে চলতে হয়। তাই কাম রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমের বিবিধ রূপান্তরে, ক্রোধ লোভ

এরাও অপেক্ষাকৃত শান্ত মূর্তিতে প্রকাশিত। তাই সেখানে প্রবৃত্তির তাড়না বার বার শাসিত বা শান্ত মূর্তি নিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

নিজের অতি প্রাচীন স্বদেশের প্রতি, স্বদেশবাসীর প্রতি ও তার যুগযুগবাহিত সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা, আন্তরিক প্রীতি ও অকপট আসক্তি ছিল বলেই তাঁর গল্পে সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে বার বার নির্মল সত্যবোধের জয়ঘোষণা দেখেছি। সে সত্যবোধ যেমন ভারত-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অংশ, তেমনি বৃহৎ মানব-সংস্কৃতিরও সার্বজনীন শ্রেয়বোধ। অবশ্য সংস্কারের ও মার্জনার অভাবে আবার মলিন হয়ে এসেছে, আধেয়ের উপরও মলিনতার আস্তরণ পড়েছে। কিন্তু জীবনের চরম মুহূর্তে যখন শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বের সংকট-মুহূর্ত এসে আবির্ভূত হয়েছে তখন তারা প্রেয়ের ও সকল লৌকিক লাভ ও লোভের সঙ্গ ত্যাগ করে নিজেদের জীবনের ধাতুগত অভীপ্সার তাড়নায় নির্ভুলভাবে শ্রেয়ের ও সত্যের পাদস্পর্শ করে মহতী বিনষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করেছে। এ প্রসঙ্গে আমি পাঁচটি গল্পের উল্লেখ করব। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'দান প্রতিদান', 'দিদি' ও 'সমস্যা-পূরণ'। এ গল্পগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় অতি পুরাতন ও যথেষ্ট নিবিড়। গল্পাংশের সঙ্গে আশা করি সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। আমি গল্পাংশ বিবৃত না করেই প্রতিটি গল্প থেকেই কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

এক ॥

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন,—বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীরে বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে-উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি। এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

[গল্পগুচ্ছ : রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা]

দুই ॥

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো প্রমাণ আছে ?"

রাইচরণ কহিল, "এমন কাজের প্রমাণ কি করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।"

... ...

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল ; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য

লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

[গল্পগুচ্ছ : খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন]

তিন ॥

শশীভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না—রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন—সেই স্বাভাবিক শান্ত ভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস উঠিতে লাগিল, "দাদা, আমার ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে-ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে তো, হয়তো তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল—তুমি ধনী, দরিদ্র। যখন দেখিলাম এই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর খাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

[গল্পগুচ্ছ : দান প্রতিদান]

চার ॥

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কোনোমতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে 'দিদি গো, দিদি' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল—শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চির-পরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামীস্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

কিন্তু এ মিলন অধিকদিন স্থায়ী হইল না। কারণ ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তার দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

[গল্পগুচ্ছ : দিদি]

পাঁচ ॥

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।"

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইজন্যই আপনি কাশী হইতে এতদূরে আসিয়াছেন? উহাদের 'পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন?"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "সে-কথা শুনিয়া তোমার লাভ কী হইবে বাপু!"

বিপিন ছাড়িলেন না—কহিলেন, "অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আর এই মুসলমান-সন্তানের জন্য আপনার এতদূর পর্যন্ত

অধ্যবসায়! আজ এত কাণ্ড করিয়া যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।"

কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়ো, অছিমদ্দিন তোমারই ভাই হয়, আমার পুত্র।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "যবনীর গর্ভে?"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "হাঁ বাপু।"

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, "সে সব কথা পরে হইবে, এখন আপনি ঘরে চলুন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমি তো আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্মে যাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধপূর্বক কম্পিত কলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

[গল্পগুচ্ছ : সমস্যাপূরণ]

যে সংসারে আদালতে দুখানা উইল দাখিল হলে একপক্ষে বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও অন্যপক্ষে নিজ পুত্রের দাবীর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে নিজের একমাত্র পুত্রের মিথ্যা দাবীকে অস্বীকার করে বিধবা ভ্রাতৃবধূর পক্ষের উইলকে সত্য বলে স্বীকার করতে বাধে না কাশীবাসী বৃদ্ধ রামকানাইয়ের; যে সংসারে প্রভুর পুত্র নিজের ত্রুটিতে নদীর জলে হারিয়ে গেলে নিজের একমাত্র পুত্রকে সুশিক্ষিত করে প্রভুর হাতে তুলে দিয়ে নিঃস্ব হওয়াকে অশিক্ষিত মূর্খ রাইচরণ বিধিনির্দিষ্ট দায়মুক্তি বলে মনে করে; যে সংসারে গোপনে ভাইয়ের সম্পত্তি আইনের কুটিল পথে স্বনামে গ্রহণ করে ভাইয়ের জীবনের শেষ মুহূর্তে রাধামুকুন্দের পরিপূর্ণ স্বীকারোক্তি দিতে বাধে না; যে সংসারে মৃত্যু ধ্রুব জেনেও স্বামীর বিরোধিতা করে পুত্রতুল্য মাতৃহীন কনিষ্ঠ সহোদরের দাবীকে শশীকলা সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করে; যে সংসারে সম্মানিত, বৃদ্ধ বৈষ্ণব জমিদার কৃষ্ণগোপাল নিজের সমস্ত সম্মান, সম্ভ্রম ও চরিত্রখ্যাতির বিনিময়ে যবনীর গর্ভজাত সন্তান অছিমদ্দিনকে নিজের পুত্র বলে স্বীকার করতে কাশী থেকে ফিরে আসেন, সে সংসার বড় ভীষণ নির্মলতা ও কঠোর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার ভিত্তি মানুষের শ্রেয়বোধের উপর। বাস্তব লৌকিক জীবনে সে সংসার মূর্খের সংসার, বাস্তববাদীর চক্ষে সে এক অবাস্তব সংসার। কিন্তু এই বৃহৎ মানব-সভ্যতার ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে তারই ধারাবাহিক চর্চা আছে। সে চর্চা সচরাচর অন্তঃসলিলা হয়ে বহমান থাকে। তাই বলে সে অবাস্তব নয়; লৌকিক ও বাস্তব জীবনের মতই সে সমান সত্য। মহাকবি এই গল্পগুলির মধ্যে ভারতের জীবনধারার সেই ভীষণ নির্মল ও কঠোর সুন্দর মূর্তিকে পুনরায় আবিষ্কার করে আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন তাই নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠতর কৃতিত্ব অন্যত্র। তিনি এত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে অতি সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে তাকে আবিষ্কার করেছেন যার অর্থ হল এই শ্রেয়বোধ একান্ত সহজভাবে, এক স্বাভাবিক অবস্থিতির মত তাঁর স্বদেশের জীবনে অভ্রান্ত ভাবে অবস্থান করছে। অতি সামান্য ও সাধারণের মধ্যে সেই ধ্রুব ও শ্রেয়ের অভ্রান্ত প্রকাশ। তাঁর স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর জীবনে যে ধারাবাহিক সাধনা নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শেষ হয়ে যায় নি, কেবলমাত্র তার উপরে মলিনতার আস্তরণ পড়েছে মাত্র, তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রেমের অন্ত ছিল না। তাঁর সেই পরিমাপহীন শ্রদ্ধা ও প্রেম এগুলিকে আবিষ্কার করে শ্রদ্ধা ও প্রেমের অর্ঘ্যের মতই তাঁর স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন

করেছে। তাঁর স্বদেশবাসী নিজের অপরিচিত বা বিস্মৃত মূর্তিকেই এই রচনাগুলির দর্পণের মধ্যে আবার দেখতে পেয়েছেন।

পাঁচ

একথা অবশ্যই নিশ্চিত যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। তাঁর স্বদেশের একটি ভাবমূর্তিকে তিনি অন্তরে অন্তরে সর্বদা দেববিগ্রহের মত বহন করতেন। কিন্তু সে বিশুদ্ধ ভাবমূর্তি হয়ে তাঁর জীবন-ধ্যানে কোন বিচ্ছিন্ন কিছু হয়ে বিরাজ করেনি। তিনি অহরহ দেশের মৃন্ময় ও চিন্ময় দ্বিবিধ অস্তিত্বের মধ্যেই খণ্ডিত বিশেষ আধারে সেই সম্পূর্ণকে দেখেছেন। তাঁর স্বদেশবাসী জনগণ তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই ভাবমূর্তির অংশ ছিল। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী অতি বৃহৎ সাধনার মধ্য দিয়ে স্বদেশের সমস্ত মালিন্য ও গ্লানিকে একান্ত মমতা ও বিবেচনার সঙ্গে দূর করতে চেয়েছেন তা তাঁর বহুবিধ চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে বার বার প্রকাশিত হয়েছে। নিষ্পেষিত, দুর্বল, শিক্ষাহীন, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন স্বদেশবাসীর দারিদ্র্য, চারিত্রিক দুর্বলতা, শিক্ষাহীনতা কুসংস্কার তিনি যেমন দূর করতে চেয়েছেন তেমনি এই সব মিলিয়ে তাদের যে সমগ্র জীবন তার প্রতি তাঁর মমতার অন্ত ছিল না। তাদের সাধুতা, সততা ও নম্রতা শিক্ষাভিমানী বিত্তবানরা আঘাত করলে বা ব্যঙ্গ করলে তিনি সে আঘাত ও ব্যঙ্গকে কখনও ক্ষমা করেন নি। মা যেমন নিজের অজস্র ত্রুটিযুক্ত সন্তানকে সর্বদা দুই হাত দিয়ে আগলে ফেরেন তিনি তেমনি ভাবেই আপনার বহু-দোষে-দুষ্ট স্বদেশবাসীকে মমতার বাহুপ্রসারে আগলে রেখেছিলেন। নীচের সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ দেবে ঃ

এক ॥

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নীকে বলিলেন, "বাই জোভ। লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।"

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল—বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল। আমার স্বাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।

দিদি বলিলেন, "বটে? লোক কে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভাল বলে জানতুম।"

কারারুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বুদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত সহর খুঁজিলে মিলে না।

[গল্পগুচ্ছ ঃ রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা]

দুই ॥

বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সে-কালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে। শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ না থাকার এই ফল।

... ...

সূক্ষ্মবুদ্ধি উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকিলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। সে বরাবরই সন্দেহ করিত, কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে ভালো

করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতোই সব বেটা। সংসারে সাধু-অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট। যাহা হউক কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়া ধর্ম মহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কী যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

[গল্পগুচ্ছ : সমস্যাপূরণ]

তিন ॥

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ, যাহার বিকশিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার এই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারী ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস নে।"

[গল্পগুচ্ছ : অনধিকার প্রবেশ]

দেশের কেন্দ্রস্থলের কলরব ও উচ্ছ্বাস থেকে অনেক দূরে দারিদ্র্যে, অশিক্ষায় ও নির্জনতায় নির্বাসিত বাংলার পল্লীজীবনে সত্যের ও জীবনমহিমার সহজ মাহাত্ম্য সহজে দৃষ্টিগোচর হবার কথা নয়; রবীন্দ্রনাথ তাদের থেকে লৌকিক দূরত্বে অবস্থিত থেকেও অভ্রান্তভাবে তাকে দেখতে পেয়েছেন ও আমাদের দেখিয়েছেন। যে প্রতিভাবলে তিনি একে দেখতে পেয়েছেন, তার মূল উপাদান হল এই দূরান্তবর্তী অকিঞ্চন স্বদেশবাসীর সম্পর্কে প্রেম ও শ্রদ্ধা। এই কারণেই শিক্ষাভিমানী, বুদ্ধির অহংকারে অহংকৃত যে সব মানুষ স্বদেশের এই সনাতন জীবনধারার সঙ্গে বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এই জীবনধারার মাহাত্ম্যকে, প্রীতি ও শ্রদ্ধার অভাবে, অনুভব ও উপলব্ধি করবার শক্তি হারিয়েছেন তাঁদের অতি তীব্র ব্যঙ্গের দ্বারা তিরস্কৃত করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নি। এই সব শিক্ষাভিমানী, অর্থবান 'আধুনিক' মানুষের চেয়ে কাশীবাসী সাধারণ বৃদ্ধ, পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ বৈষ্ণব জমিদার, অতি সাধারণ পল্লীবধূ, পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী গৃহস্থ, অতি দরিদ্র গৃহভৃত্য, কঠোর চরিত্রের আচারপরায়না বিধবা প্রভৃতির মত একান্ত সাধারণ অথচ জীবনের ধ্রুব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত মানুষগুলি তাঁর কাছে অনেক অনেক বেশী শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে; অপর পক্ষে ওই সব শিক্ষাভিমানী, স্বদেশের সংস্কৃতিবিচ্ছিন্ন ওই 'আধুনিক' মানুষগুলিকে তিনি অনাত্মীয় জ্ঞান করেছেন ওই সহানুভূতিহীন ও শ্রদ্ধাহীনতার জন্যই।

ছয়

স্বদেশের যে সব মানুষ গ্রামের মধ্যে বাস করেন তাঁদের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে কী পরিমাণ উৎপাত ও উপদ্রব হয়, তাঁদের প্রাত্যহিক জীবন একাধিক কঠিন হস্তের দ্বারা কী পরিমাণ লাঞ্ছিত, প্রাত্যহিক প্রাণধারণ ও দিনযাপনের গ্লানি কী পরিমাণ পুঞ্জীভূত তা তাঁর অগোচর ছিল না। তাঁদের এই যন্ত্রণা অসহায়-অক্ষমের যন্ত্রণা বলে তাঁর বুকে আরও বেশী করে বাজত। উৎপীড়নের বিবিধ হস্তের মধ্যে শাসক রাজার শ্বেত হস্ত ছিল, তাঁদেরই আশ্রয়-পুষ্ট জমিদার, জমিদারের আমলা ও মহাজনের হাতও ছিল। অত্যাচার হত, সে অত্যাচারের প্রতিকার ছিল না। তাঁর অন্তর বার বার এই বেদনায় মন্থিত হয়েছে, বার বার এই অত্যাচারকে ধিক্কার দিয়েছেন। সে অন্যায় প্রতিকারের অবুঝ কল্পনা মধ্যে মধ্যে 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি' পর্যন্ত প্রসারিত। দীন-দরিদ্র স্বদেশবাসীর সম্পর্কেও তাঁর এতখানি সম্ভ্রমবোধ ছিল বলেই তাঁর সংস্কারমুক্ত বুদ্ধি ও ভয়হীন হৃদয় এই অবুঝ কল্পনাকে হাস্যকর জ্ঞান করে নাই। এ সম্পর্কে সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

এক ॥

গোরা যখন দেখিল ছাত্রদিগকে মারিতে মারিতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে সে সহিতে পারিল না, সে কহিল, "খবরদার! মারিস নে!" পাহারাওয়ালার দল তাহাকে অশ্রাব্য গালি দিতেই গোরা ঘুষি ও লাথি মারিয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া তুলিল যে রাস্তায় লোক জমিয়া গেল।

[গোরা : ২৮ পরিচ্ছেদ]

দুই ॥

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন ; হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন "সাহেবের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লড়িব।"

[গল্পগুচ্ছ : মেঘ ও রৌদ্র]

তিন ॥

পুলিশ বাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন সময় চশমাপরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চট্‌চট্‌ করিতে করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পুলিশের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "সার, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোন অধিকার নাই।"

পুলিশের বড় কর্তা তাঁহাকে হিন্দী ভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মুহূর্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।

[গল্পগুচ্ছ : মেঘ ও রৌদ্র]

বলা বাহুল্য এই তীব্র ক্ষোভের আকস্মিক ও অবুঝ প্রকাশের ফলাফল গোরা বা শশীভূষণ কারও পক্ষেই আরামের হয় নাই। তাদের দুজনকেই কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। এই আঘাতের ফলাফল কি হবে তা তারা উভয়েই জানত। কিন্তু অসহায় অক্ষম মানুষকে রক্ষা করবার কর্তব্যবোধ তাদের স্থির থাকতে দেয় নি। তাদের

আত্মমর্যাদাবোধই তাদের এ কাজে প্রবুদ্ধ করেছিল। যে তীব্র জ্বালা ও ক্ষোভ তাদের প্রজ্বলিত করেছিল সে ক্ষোভ ও জ্বালা তো তাদের স্রষ্টারই হৃদয়ের! এই বোধ থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকার যবনীর গর্ভজাত অছিমদ্দিনকে আপনার পুত্র বলে স্বীকার না করে পারেন নি। এই বোধ থেকেই 'বিচারক' গল্পের স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান মোহিতমোহন দত্ত এক পতিতা রমণীকে একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখেছিলেন।

সাত

আমাদের তরুণ বয়সে সাহিত্যক্ষেত্রে যখন সদ্য প্রবেশ করেছি তখন মধ্যে মাঝে শুনেছি মহাকবি দেশের দীনদরিদ্র মানুষদের দেখেন নি এবং তাদের সম্পর্কে সামান্যই জানতেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে বর্তমান সুপ্রচুর গবেষণার ফলে এ সত্য এখন প্রমাণিত যে এই ধরনের অভিযোগ অমূলক, আমি সেই সম্পর্কেই সামান্য কয়েকটি কথা বলব।

বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলের গ্রামীণ মানুষদের জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে ভূমিনির্ভর। সেই ভূমি-নির্ভরতা আবার সম্পূর্ণরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দড়ি আর চাকায় বাঁধা। উনবিংশ শতাব্দী সম্পূর্ণ, এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশ, এই দেড়শো বছরের বাংলার পল্লী-মানুষের জীবন এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্রে রেখেই বিবর্তিত হয়েছে। অন্যদিকে বাংলা দেশের এই সমসাময়িক কালের সাহিত্য সৃষ্টিকে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে এই সৃষ্টির একটা বৃহৎ অংশ বাংলার পল্লীকে অবলম্বন করে। অবশ্য ধীরে ধীরে পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার পরিমাণ কমে আসছে। কারণ জাতীয় জীবনে এক দিকে শিল্পোন্নয়নের ফলে পল্লীজীবনে দ্রুত নাগরিকতার স্পর্শ লাগছে, অন্য দিকে পাঠকসমাজের, এমনকি পল্লীর পাঠকসমাজেরও রুচি নগরজীবনকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। আজ যে সমস্ত সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনের সামনে প্রতিদিন নানা মূর্তিতে এসে দাঁড়াচ্ছে তারাও রূপে মূলত নাগরিক। কিন্তু পল্লীজীবনের সমস্যাও যে কম নয় তা গত তিন চার বৎসরের ইতিহাস ভাল করেই প্রমাণ করেছে আবার। পল্লীর জীবন যে আসলে ভূমিনির্ভর সেই কথাটাই আবার ব্যাপকভাবে ও তীব্রভাবে প্রমাণিত হয়েছে গত কয়েক বৎসরের আন্দোলন ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে।

বাংলা সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ যদিও পল্লীজীবনের কথা নিয়ে রচিত ও পল্লীজীবনের দুঃখকষ্টের যথেষ্ট পরিচয় তাতে আছে, এই ভূমিনির্ভর এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে যুক্ত জীবনের প্রকাশ রবীন্দ্র-পরবর্তী-সাহিত্যে কতটুকু ঘটেছে? উত্তরে বলতে হবে, সামান্যই। শরৎচন্দ্র এই জীবনকে কোথাও কোথাও স্পর্শ করেছেন, তারপর আর এক আধ জন মাত্র তাকে বিষয়বস্তু করে সাহিত্য রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার পর এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ কাল কেটে গিয়েছে। তবু এই ভূমি-কেন্দ্রিক রচনার পরিমাণ যৎসামান্যের বেশী নয়। বাংলা দেশের ভূমি-ব্যবস্থাকে না জানলে গ্রামের মানুষের সে জীবনকে জানা সম্ভব নয়। ভূমি-নির্ভর, এমন কি ভূমি-সর্বস্বও বলতে বাধা নেই, সেই ভূমি-সর্বস্ব জীবনের পরিচয় আজ থেকে আশী বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি জানতেন। তাই পল্লীজীবনের আসল সমস্যা ও দুঃখকে তিনি চিনতেন ও জানতেন। ঠাকুর-পরিবারের বিস্তৃত জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে এই অভিজ্ঞতা তাঁর ঘটেছিল।

মাত্র একটি গল্পে তিনি তাঁর এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। অকল্পনীয় দারিদ্র্যে, অপরিসীম নিঃস্বতায়, অন্তহীন আশাহীনতায় যে জীবনযাপন সে জীবনে যে অন্তহীন ছেদহীন কলহ ও তিক্ততা কখনও উচ্চরোলে, কখনও নিঃশব্দে বাসা বেঁধে

থাকে সেই কলহের বর্ণনা দিয়ে গল্পের আরম্ভ। তাদের গৃহাঙ্গনের পরিবেশও তেমনি দুঃসহ।

> বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলো অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।
>
> [গল্পগুচ্ছ : শাস্তি]

এই পরিবেশে যারা বাস করে তাদের সেই বর্ষার একদিনের পরিশ্রম ও উপার্জনের কথা শুনুন :

> দুখিরাম ও ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলি ধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্যই দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে, কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে ; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটা কতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছে,—উচিত মতো পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।
>
> [গল্পগুচ্ছ : শাস্তি]

এই যাদের পারিবারিক সঙ্গতি ও উপার্জনের চিত্র তাদের উপার্জনের পটভূমির পশ্চাতে পাওনাদার ভবিতব্যের মতো অপেক্ষা করে থাকে :

> চক্রবর্তীদের বাড়ীর রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি ; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ী ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।
>
> [গল্পগুচ্ছ : শাস্তি]

এই যেখানে একজনের সামগ্রিক জীবনের মূর্তি সেখানে ভয়ঙ্কর যে সদাসর্বদা আততায়ীর মত গোপনে অপেক্ষা করে থাকবে এবং সুযোগ পাবা মাত্র ভয়াল হাসি হেসে আত্মপ্রকাশ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? সুযোগ মাত্রেই সে ভয়াল অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করলে :

> ক্ষুধিত দুখিরাম আর কাল বিলম্ব না করিয়া বলিল, "ভাত দে।"
>
> বড়ো বউ বারুদের বস্তায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো এক মুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ পরিমাণ করিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"
>
> সারা দিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত

ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষে দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বলিলি।" বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোট জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

[গল্পগুচ্ছ : শাস্তি]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রথযাত্রাই আমাদের গত দেড় শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির একটা বৃহদংশ রচনা করেছে, সেই রথযাত্রায় বাংলা দেশে জমিদারীর নাটমঞ্চ আলোকোজ্জ্বল ও উৎসবমুখর হয়েছে, সংস্কৃতির মেলা জমজমাট হয়েছে, সেই রথযাত্রার কল্যাণে ও প্রসাদে উদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণী সেই বাজারে হাসিমুখে কেনাকাটা করেছে এসবই সত্য; কিন্তু তার চেয়ে আরও সত্য এই যে, যে অগণিত নির্বাক দরিদ্রের উপর বংশানুক্রমিকভাবে এই রথের দড়ি টানার ভার পড়েছিল, তাদের কতজনের শ্রমের স্বেদজলে ও ক্লেশের অশ্রুজলে সেই রথের গতিপথ কত পিচ্ছিল হয়েছে, এবং সেই জগদ্দল যন্ত্রের চাকায় যে কতজনের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হয়ে গিয়েছে তার হিসাব এই বৃহৎকালব্যাপী সংস্কৃতির পৃষ্ঠায় কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে যৎসামান্য দুর্লভ স্থানে তার কথা ধরা আছে তার মধ্যে উপরের কাহিনীটি একটি। প্রায়-অন্তেবাসী একটি দরিদ্র পরিবারের এই কাহিনীতে সেই অস্থি-পঞ্জর নিঃশেষে চূর্ণ হবার নিঃশব্দ ইতিহাস পরম শ্রদ্ধা ও একান্ত বেদনার সঙ্গে বিধৃত হয়ে আছে।

সেই সঙ্গে তিনি জানতেন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে কালের পর্বান্তরে সব কিছুর পরিবর্তন ঘটে যাবে। দীন-দরিদ্র, সামান্য লোক আর সামান্য থাকবে না। অন্ততঃ অসামান্যের পটভূমিকায় সামান্য হয়ে সে বিরাজ করবে না। সকলের সঙ্গে সাধারণ একজন হয়ে সে বিরাজ করবার অধিকার পাবে। আজ ইতিহাসের রথচক্র আবর্তনের সঙ্গে কাল পরিবর্তিত হতে চলেছে। তার প্রথম পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে। নূতন ভূমি-বণ্টন-প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের মধ্যে তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ উদ্যত। কালে আরও অনেক পরিবর্তন ও অধিকার আসবে সামান্য লোকদের জন্য। এই পটভূমিতে আজ থেকে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে, ১৩০২ সালে রচিত 'সামান্য লোক' নামক কবিতাটি ভবিষ্যৎবাণীর মতই শোনাবে :

সন্ধ্যাবেলা লাঠি হাতে বোঝা বহি শিরে
নদীতীরে পল্লীবাসী ঘরে যায় ফিরে।
শত শতাব্দীর পরে যদি কোন মতে
মন্ত্রবলে, অতীতের মৃত্যুরাজ্য হতে
এই চাষি দেখা দেয় হয়ে মূর্তিমান
এই লাঠি কাঁধে লয়ে, বিস্মিত নয়ান,
চারি দিকে ঘিরি তারে অসীম জনতা
কাড়াকাড়ি করি লবে তার প্রতি কথা।
তার সুখ দুঃখ যত, তার প্রেম স্নেহ,
তার পাড়াপ্রতিবেশী, তার নিজ গেহ,
তার খেত, তার গোরু, তার চাষ-বাস,
শুনে শুনে কিছুতেই মিটিবে না আশ।
আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

এই পংক্তি কয়টির মধ্যে তিনি সেই অনাগত দিনকেই প্রত্যুদ্‌গমন করে যেন হাত বাড়িয়েছেন বলে মনে হয়। সামান্য লোকের অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট তিনি অসামান্য মানুষ হয়েও, তাদেরই মত মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন বলেই সামান্য লোকের সেই দুঃখ-কষ্টের দিনটি যেদিন মিলিয়ে বদলে গিয়ে ভিন্নতর দিনের মূর্তি নেবে সেই দিনের ঐকান্তিক প্রত্যাশাই প্রকাশ করেছেন। ইতিহাসের এক মেঘমুক্ত প্রসন্ন প্রভাতকে প্রত্যুদ্‌গমনের ও অভ্যর্থনার শ্রেয় বাণীই তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম বাণী।

তৃতীয় বক্তৃতা

রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসমাজ

এক

আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলে জননী !

বাংলা দেশের হৃদয় হতে মহাকবি যাঁকে একদা অপরূপ রূপে আবির্ভূত হতে দেখেছিলেন, বলা অবশ্যই বাহুল্য যে, সে মূর্তি দেশজননীর কোন মৃন্ময়ী মূর্তি নয় ; সে জননীর এক চিন্ময়ী মূর্তি। এ মূর্তিকে মহাকবি কোথায় দেখেছিলেন ? আদৌ দেখেছিলেন কি ? না, এ তাঁর ভাবগাঢ় কল্পনার মূর্তি ?

আমাদের এই প্রাচীন দেশে, আজ এসব একান্ত অবিশ্বাস্য কল্পকথা হলেও, বিগত দিনে কালে কালে মহাপুরুষ সাধকরা পরমেশ্বরীকে বাঞ্ছিত মূর্তিতে দর্শন করে মানবজন্ম ধন্য করেছেন। মহাকবিও আধুনিক কালে সেই মহৎ সাধনধারায় একজন অতি যোগ্য উত্তর-পুরুষ। সেই কারণে বিশ্বাস করি, এ দর্শন শুধুমাত্র ভাবগাঢ় কবিকল্পনা নয় ; সত্য দর্শন। তিনিও বাঞ্ছিত মূর্তিতে পরমা জননীকে দর্শন করেছেন।

তবে এই দর্শনের রীতি-প্রকৃতি ভিন্ন। তিনি বাংলা দেশের আধারে সেই চিন্ময়ী জননীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু তাঁর দিব্য-দর্শনের এই যে আধার বাংলা দেশ, এ বাংলা দেশের স্বরূপটি নির্ণয় করতে পারলেই সেই সত্যকে আমরা জানতে পারব। এ কি শুধুমাত্র দেশের মৃত্তিকা ? নিশ্চয়ই নয়। তা হলে দেশের সমাজ ? বা দেশের অগণিত মানুষ ? বিচ্ছিন্ন ও পৃথকভাবে তিনের কোনটিই নয়। এই তিন একসঙ্গে মিলে তাঁর সমগ্র মূর্তি। দেশের মৃত্তিকাময়ী মূর্তি সেই জননীর সুবিস্তীর্ণ মাতৃক্রোড় ; দেশের সমাজ জননীর চেতন বুদ্ধি ও করুণার আধার ; দেশের অগণিত মানুষের চৈতন্যের মধ্যে জননীর সর্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ। স্বদেশের মৃত্তিকা ও তার পরিমণ্ডল, স্বদেশের সমাজ এবং স্বদেশের স্বজন—এই তিনে মিলে এক অখণ্ড মূর্তিতে প্রকাশিত দেশজননীকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি বিচিত্র কথা এখানে উল্লেখ করি। মহাকবি পরমেশ্বরকে স্মরণ মাত্রেই পুরুষের মূর্তিতে কল্পনা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা, কখনও বা প্রভু কি বন্ধু বলে। কিন্তু দেশের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে কখনও মা ছাড়া অন্য মূর্তিতে কল্পনা করেন নি, করতে পারেন নি। আমার অন্তত এই ধারণা।

দেশের সমাজকে আমি পূর্বেই মহাকবির দৃষ্টিতে দেশের ভাবমূর্তির অবিভাজ্য অংশ এবং উপমার আশ্রয় নিয়ে দেশজননীর চেতনা বলে উল্লেখ করেছি। সে চেতনার আধারে জননীর প্রজ্ঞা ও করুণার অমৃত বিধৃত। আজ আমি মহাকবির পল্লীসমাজ সম্পর্কে চিন্তা ও ধারণার কথা বলব।

দুই

বাংলা দেশের ও বঙ্গসংস্কৃতির পরম সৌভাগ্য যে মহাকবি এমন মুহূর্তে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মেছিলেন যখন "বেশে-ভূষায়, কাব্যে-গানে, চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায়

তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।" কাজেই তিনি শিশুকাল থেকেই জন্মসূত্রে অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে স্বাদেশিকতার একটি স্পষ্ট আদর্শের মধ্যে দেশের স্পর্শলাভ করেছিলেন। সেই স্বাদেশিকতার বোধ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার একটি বিশিষ্ট অংশ ও অঙ্গ হিসাবে ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে একটি পরিণত মূর্তি লাভ করেছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ প্রয়োজন যে তাঁর স্বাদেশিকতার চিন্তা সমসাময়িক অন্য সকলের চিন্তা থেকে বিশেষভাবে পৃথক; সেই কারণেই সে চিন্তা যত বিশিষ্ট তত একক। এই চিন্তার যে বীজ তিনি বাল্যকালে জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন তাকে তাঁর জীবনের সমগ্র চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে একযোগে বিচার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, বিগত কালের শাস্ত্র, ধর্ম ও ইতিহাস থেকে জ্ঞানসঞ্চয় করে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজের বুদ্ধি ও রুচি যতখানি এগিয়ে যেতে দিয়েছে ততখানি নিজেকে যুক্ত করেছেন, আবার নিজের স্বাধীন বুদ্ধি ও চারিত্রিক প্রবণতা ও বিবেচনা অনুযায়ী তার থেকে সরে এসে নিজের মানসিক সিদ্ধান্তের স্থিরভূমিতে দাঁড়িয়েছেন। হয়তো এ কথা এইভাবে বললেই আরও সঠিক হবে যে তিনি যেখানে থাকবার সেইখানেই ছিলেন বরাবর; তৎকালীন ইতিহাসের অনিবার্য আকর্ষণে রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথ কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলেন; আবার সেই অনিবার্য আকর্ষণেই তিনি এবং রাজনীতি দুইই আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে করতে পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

মহাকবির স্বাদেশিকতার মূর্তি পলিটিক্যাল স্বাদেশিকতা থেকে পৃথক। এ বিষয়ে তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' থেকে উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন:

> বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্যই আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।
>
> ইংলণ্ডে স্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে জনসাধারণ সর্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরেজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি অবস্থা-নির্বিচারে গবর্ণমেণ্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়ত বেলেস্তা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।
>
> ... ...
>
> আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে-কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে।

মহাকবির কাছে তাঁর পরিণত জীবনারম্ভের প্রথম কাল থেকেই স্বাদেশিকতার একটি স্পষ্ট মূর্তি ছিল। এবং সে মানসমূর্তি সে সময়কার পোলিটিক্যাল বা ভিন্নতর স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যুক্ত সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চিন্তা থেকে পৃথক।

সকলেই স্বাদেশিকতা চর্চায় যে দেশকে কল্পনা করতেন সে কল্পনা অনেকখানিই, তখনকার দিনে সব চিন্তা যেখান থেকে আমাদের দেশে এসে আমাদের অল্পবিস্তর প্রভাবিত করত, সেই য়ুরোপ থেকে ধার করা। সেদিন অধিকাংশের কাজে দেশ ছিল ইংরেজী স্টেটেরই নামান্তর। যার সঙ্গে 'নেশনের' অনেকখানি আত্মিক সাদৃশ্য ও মিল আছে। মহাকবির কাছে দেশের সংজ্ঞা ছিল ভিন্ন। দেশের মূর্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ করতেন সমাজের মধ্যে। দেশের সমাজই তাঁর কাছে দেশের জাগ্রত মূর্তি।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে সমাজের মূর্তির মধ্যে দেশের যে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ মূর্তিকে তিনি সকলের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও চিন্তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না। এই থেকে স্থির অনুমান করা ও সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে এ সম্পর্ক তার বহু পূর্ব থেকেই তিনি বিশেষ চিন্তা করেছেন; এবং বহু চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ফলে এই বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁছেছিলেন। এখন যাকে দেশের জাগ্রত আধার বলে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার চরিত্র কেমন ছিল সেইটিই এখন আলোচ্য বিষয়।

স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে 'নেশনের' চেয়ে 'সমাজ' বড় কি ছোট, এ সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না; এবং ভাল-মন্দের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত নেই। তিনি এই কথাই স্পষ্ট-ভাবে বলতে চেয়েছেন যে য়ুরোপের চরিত্র অনুযায়ী 'নেশন'কে অবলম্বন করেই তাদের বিকাশ, স্টেটই তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা জাগ্রত পদার্থ; স্টেটের শুভাশুভের উপরেই জাতির সমস্ত মানুষের ভালমন্দ নির্ভর করে। অথচ ভারতবর্ষের চরিত্র অনুযায়ী তার সমস্ত শুভাশুভ রাজার উপর নির্ভরশীল ছিল না; ছিল সমাজের উপর।

এখন স্বভাবতই সমাজ বলতে তিনি কি বলতে চেয়েছেন সেটি জানা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন:

> আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমনভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।
>
> [স্বদেশী সমাজ: আত্মশক্তি ও সমূহ]

এই সমাজ যেন এক প্রাচীন অতিকায় কূর্মের মত। তার বয়সের পরিমাণ নাই। তার বিশালকায় প্রাচীন দেহের চারিপাশে এক সুকঠিন অদৃশ্য আবরণ, যাতে কাল থেকে কালান্তরে যত আঘাত বাইরে থেকে এসেছে, সব প্রতিহত হয়ে ফিরে গিয়েছে; সেই আবরণের অভ্যন্তরে তার চলমান প্রাণক্রিয়াকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করতে পারে নি।

ভারতবর্ষে কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত প্রাণধারা এই সমাজের মধ্য দিয়েই তার

অবশ্যম্ভাবী মূর্তিটি গ্রহণ করে নিজেকে সক্রিয় ও সচল রেখে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত করেছে। তাই ভারতবর্ষের আরাধ্য ও সাধ্য বিষয় 'নেশনের' কল্পনা নয়, সমাজের বহমানতা।

এই সমাজ আমাদের কোন্ কল্যাণ করেছে তা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> কিন্তু এ-কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে —আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহুদুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধমরা হইয়া ছোটো ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড়ো করিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।
>
> [ভারতবর্ষীয় সমাজ : আত্মশক্তি ও সমূহ]

ভারতবর্ষে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণের আধার এই সমাজ। মহাকবি ১৯০০ সালের কাছাকাছি সময়ে যখন এই চিন্তার কথা প্রকাশ করেছেন সেই সময় সমাজের এই মূর্তি ছিল। আজ, সেই কালের পর সত্তর বৎসর অতিক্রম করতে চলেছে। দুটো মহাযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘটন করেছে। সত্তর বৎসর পূর্বেও সমাজের যে মূর্তি ছিল তা আজ শুধু ভগ্ন দেবদেউলের মত ভেঙেই পড়েছে নয়, তার বোধ হয় কোন চিহ্নও আর নাই। ভূমিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, প্রায় ধ্বংসোন্মুখ ; একান্নবর্তী পরিবার প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ; নব শিল্পোন্নয়ন ও বিবিধ নব নব রাজনীতিক ও অর্থনীতিক চিন্তার ফলে আমাদের পারিবারিক জীবনে বহু ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। সে সব পরিবর্তন দিনে দিনে ধীরে ধীরে ঘটে যাচ্ছে বলে, আমরা ঠিক অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে পারি না; কিন্তু তা বিপ্লবাত্মক। এসব সত্ত্বেও বলব, বাইরের কাঠামোতে এই পরিবর্তন সর্বত্র প্রকট হলেও, কাল থেকে কালান্তরে বাহিত সেই ভাবগুলির অনেক ভাবই এখনও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নাই, য়ুরোপের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কেও আমি অনভিজ্ঞ ; তবু মনে হয় সাধারণভাবে আমাদের দেশে আত্মীয়ের জন্য আত্মীয় আজও বহু ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করে তা বোধ হয় পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলেই অপরিজ্ঞাত। আজও এই কঠিন অর্থনৈতিক চাপের মধ্যেও, আমাদের দেশের অগণিত মানুষ, যাঁরা নূতন কালের সমাজ-জীবন এবং নাগরিক-জীবনের মধ্যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এসে পড়েছেন ও তাতে অভ্যস্ত হয়ে, প্রাচীন কালের অনেক ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করে নূতন চিন্তা ও নূতন অভ্যাসকে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সমস্ত লোকলোচনের আড়ালে, 'বহু দুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করাকেই শ্রেয়' বলে মনে করেই সেই ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করে

চলেছেন। একে তাঁরা কোন গৌরবের মহৎ কর্ম জ্ঞান করেন না, অন্যকেও তা মনে করাবার চেষ্টা করেন না। এঁদের এই দৈনন্দিন গৌরবময় স্বেচ্ছাবৃত আত্মত্যাগের কাহিনী সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় না অথবা তাঁদের প্রশংসায় সভাগৃহ করতালি ধ্বনিতে মুখর হয় না। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ আজও এই মহৎ আত্মত্যাগ ও দৈনন্দিন স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্র-সাধনকে জীবনের অতি সাধারণ সহজ কৃত্যের অতিরিক্ত কিছু বলে জ্ঞান করেন না; যাঁরা আচরণ করেন তাঁরাও না, যাঁরা তা চোখে দেখেন তাঁরাও না। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, বহুকালাবধি ধারাবাহিক চর্চার ফলে এই ত্যাগের প্রবৃত্তি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় ধাতুগত সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এ সম্পর্কে চেতনাহীনতার জন্যই আমাদের মুখের প্রসন্ন আচ্ছাদনের অন্তরালে যে বিষণ্ণতা, ক্ষীণ হাসির অন্তরালে যে ক্লেশ ও দুঃখ আত্ম-গোপন করে থাকে তাকে আমরা দেখতে ও চিনতে ভুল করি; সে যে সুমহৎ যোদ্ধার সুবৃহৎ এক মহৎ জয়ের কথা এবং এক অভেদ্য কবচকুণ্ডলের কথা ঘোষণা করেছে তা আমরা বুঝতে পারি না।

চার

যদি ইতিহাসের ও কালের উজান বেয়ে একবার সেই উদ্ভবভূমি, ভাবগঙ্গোত্রীর সন্ধান করি তা হলে একে চেনা কষ্টকর হবে না। মহাকবির ভাষাতেই বলি:

> রাজা সমাজেরই অঙ্গ ছিলেন। সমাজ সংরক্ষণ ও চালনার ভার ছিল তাঁহার উপর—ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে সমাজধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন—তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল। গৃহস্থই সমাজের স্তম্ভ বলিয়া গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে জ্ঞানে, ধর্মে, ভাবে, কর্মে সমুন্নত রাখিবার জন্য সমাজের বিচিত্র শক্তি বিচিত্র দিকে সচেষ্টভাবে কাজ করিত। তখনকার নিয়ম তখনকার অনুষ্ঠান তখনকার কালের হিসাবে নিরর্থক ছিল না···আমাদের পূর্বপুরুষের সেই নিয়ত-জাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবৎসরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্তহইবে। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল—ইহাকে বাণিজ্য হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরক্ষীণ করা, ইহা হিন্দুত্ব।
>
> [ভারতবর্ষীয় সমাজ: আত্মশক্তি ও সমূহ]

এই পরিকল্পনা ঈশ্বর, ব্যক্তি-মানুষ, গৃহস্থ ও সমগ্রভাবে দেশের প্রাণযাত্রাকে একসঙ্গে একটি পবিত্র, ভাবগম্ভীর সংগীতের মত এক সুরে গেঁথে মানুষের জীবনে একটি মহৎ ও পরিচ্ছন্ন ভাবের পরিমণ্ডল রচনা করে তার প্রাত্যহিক জীবনকে একান্ত সূক্ষ্মভাবে অথচ একান্ত সহজে একটি মহৎ আদর্শের সঙ্গে অভ্রান্তভাবে চিরকালের মত যুক্ত ও চলমান করে দিয়েছে। কালের গতির সঙ্গে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত পরিবর্তন সাধিত হয় নি বলেই তা পরবর্তীকালে সমাজের সম্পূর্ণ প্রাণধারাকে ধারণ করতে পারে নি। সংস্কারের অভাবে তার খাত মজে এসেছে। যদিও কোনক্রমে কালে কালে কালোপযোগী প্রয়োজনীয়

সংস্কার সাধন সম্ভব হত তা হলে আজও সমাজ নিজের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে দেশের বৃহৎ জনমানসের সমগ্র জীবনধারাকে সেই পুরাতন ধ্রুব সংগীতের মতই ধারণ করতে পারত এবং যা তার পক্ষে বিষম ও বিরোধী তাকে অক্লেশে প্রতিহত করতে পারত।

কিন্তু তা হয় নি, হয় না বলেই হয় নি। ইতিহাসের নিয়ম হয়তো তা নয়। এবং হয় নি বলে আক্ষেপ করেও লাভ নেই। কিন্তু যা হয়েছিল, তাও টিঁকে ছিল এবং টিঁকে আছে বহুকাল ধরে। বহু বহু শতাব্দীর সেই বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও চেষ্টা করলে কিছু কিছু দেখা যাবে। বিচ্ছিন্ন এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে মানবজীবন তখন একটি আদর্শমুখী ছিল একথা উল্লেখ করলাম; তার বাইরের শৃঙ্খলার কথাও মহাকবির উক্তি উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছি। এবার তার মানসমূর্তির সামান্য বর্ণনা মহাকবির রচনা থেকেই দিই:

> মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামী-প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে—এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুত্রস্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্য। আমরা যে-কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এইজন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্যসাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না।
>
> [স্বদেশী সমাজ: আত্মশক্তি ও সমূহ]

এর সামগ্রিক ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ভাষায় ও ভঙ্গিতে বললে বলতে হয়, চতুর্বর্গ লাভ হত; লাভ হত অর্থ ও পরমার্থ; ইহজীবন এবং পরজীবন দুইই পরিপূর্ণ হত; লাভ হত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। আজকের ভাষায় বললে বলতে হয়—ব্যক্তি-চরিত্রের সামগ্রিক বিকাশ হত আত্মশক্তি উদ্বোধনের পথে এবং সমাজে একটি সুস্থ সমষ্টি-শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ হত। মানব-জীবনে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেয়তর ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? যে ব্যবস্থা বহু শতাব্দীর প্রাচীনতা নিয়েও জরাগ্রস্ত হয় না, যার মধ্যে যাবতীয় বাইরের আঘাতকে প্রতিহত করে নিজের জীবনধারাকে সহজে ও স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত করার শক্তি, যার মধ্যে মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধনের পথে তার সামগ্রিক চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা, তার চেয়ে বাঞ্ছিত ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

পাঁচ

কিন্তু বহুকালের মহা-প্রাচীন হয়েও যে জীর্ণ হয় নি, ইংরেজ-শাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার প্রাচীনতার মধ্যে জীর্ণতার স্পর্শ ধরা পড়ল। মহাকবির পরিপূর্ণ ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে তার মাহাত্ম্যই শুধু ধরা পড়ে নি, তার জীর্ণতাও দৃষ্টিগোচর হল। সেই জীর্ণতার সুযোগে নবীন কালের নগরসভ্যতার পত্তন হল দেশে। নগর পল্লীর রস শোষণ করতে লাগল। ভারতবর্ষের সনাতন পল্লীসমাজের মধ্যে এতকাল ধরে যে-মন, যে-চরিত্র ছিল, পল্লীসমাজ মানুষকে চরিত্রের যে গড়ন দিত, তার ফলে আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত মানবচিত্ত একান্ত সহজে, না জেনেও, না বুঝেও শ্রেয়কে জীবনের কেন্দ্রমূলে প্রতিষ্ঠা দিতে পারত, গৃহস্থ হয়ে সংসারের যাবতীয় কর্মকে কর্মযজ্ঞের মত অনুষ্ঠান করতে পারত।

কিন্তু কালক্রমে মানবচিত্তের মধ্যে সে প্রবাহের খাতে তামসিক আলস্যের ও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বালি জমে তাকে মজা খাতে পরিণত করেছিল। একেই তিনি বার বার আপনার চারিপাশে প্রত্যক্ষ করেছেন। মনের মধ্যে সনাতন সমাজ-মূর্তির জাগরূক ধ্যানের সঙ্গে বাইরের প্রকাশকে মিলিয়ে পান নি। সমাজের মানবচিত্ত তখন উৎসাহহীন ও অবসন্ন; কর্মযজ্ঞের সে ধারণা তখন মানবচিত্ত থেকে বিলুপ্ত হয়েছে; মানুষ তখন অশিক্ষায়, শিক্ষা-হীনতায় আত্মমগ্ন; মহৎ ধ্রুব ঐকতান সংগীতের তার থেকে স্খলিত হয়ে জৈব দুর্বুদ্ধির তাড়নায় তাড়িত; প্রাচীন কালের ধ্যান-ধারণা সব ছেঁড়া মালার পাথরের মত ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গিয়েছে। তারই ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সৃষ্ট বাংলা দেশের নূতন জমিদার সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি ও জমিদারীর কেন্দ্রস্থল, স্বগ্রামে বসবাস ত্যাগ করলেন; তাঁরা অধিকাংশ জনই তাঁদের ভূসম্পত্তির মুনাফা স্বগ্রামে বাস করে খরচ করেন নি; ক্ষেত্র বিশেষে কিছু অংশ খরচ করলেও, তার অধিকাংশটাই নবীন কালের নূতন শহর কলকাতায় বাস করে সেখানেই খরচ করেছেন। পল্লীসমাজের মানুষের দেওয়া অর্থ, পূর্বকালের মত, পল্লীতে ব্যয়িত হয় নি; ব্যয়িত হল কলকাতায়। অথচ পূর্বকালে এর বিপরীত ঘটত:

> পূর্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রাসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তি লাভের জন্য সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজ-রাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লি তাঁহাদিগকে যে-সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের অখ্যাত গ্রামেও কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্ব চর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্রই রক্ষিত হইত।
>
> [স্বদেশী সমাজ: আত্মশক্তি ও সমূহ]

সমাজের যে মূর্তির মধ্যে তাঁর স্বদেশের কল্যাণ নিহিত ছিল, কিন্তু যে মূর্তি তখন বিগতশ্রী, বিগতমহিমা বিগতরূপ, সেই মূর্তিরই নব রূপায়ণ তিনি বার বার কামনা করেছেন। যে কোন পোলিটিক্যাল সিদ্ধির চেয়ে এই প্রাচীনকে সংস্কার করে নবরূপে তাকেই প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে যে শ্রেয়লাভের সম্ভাবনা, সেই কথাই বার বার উচ্চারণ করেছেন। সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর মত-পার্থক্যের মূল কারণ এইখানে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম থেকে তার সঙ্গে সাময়িক ভাবে যুক্ত হয়েও তিনি স্পষ্টভাবে এই পৃথক ও ভিন্ন বার্তা বার সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের সময়েই ১৯০১ সালের মধ্যে স্বদেশের মানুষের স্বার্থ ও পরমার্থ লাভের মূল উপায় হিসাবে তিনি তাঁর এই চিন্তা স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করেছিলেন।

এসব আজ ইতিহাসের কথা। তবু সংকোচের সঙ্গেই বলি, মহাকবির স্বাদেশিকতার এই চিন্তা পরাধীনতার বেদনাবিদ্ধ জাতি স্পষ্টভাবে দেখতেও পায় নি, বুঝতেও পারে নি, গ্রহণও করে নি। সেদিনের পরশাসনের অধীনতাজনিত যে জ্বালা তাতে জাতির বুঝবার অবকাশ বা মন কোনটাই ছিল না। চিন্তার ও ভাবনার যে নির্মল, অনাবিল আকাশে

মহাকবির এই ধ্যান-ধারণা তাঁর কাছে একান্ত স্বচ্ছ ও ধ্রুব বলে ধরা পড়েছিল, পরাধীনতার যন্ত্রণায় জাতির মেঘাচ্ছন্ন চিত্তাকাশে এ লেখার প্রতিবিম্ব পড়তে পারে নি।

সেদিন পরশাসনের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। মানুষের ব্যক্তি-জীবনের ও মানব-সমাজের ধ্রুব ও স্থায়ী কল্যাণের পটভূমিকায় সমস্ত সমস্যাটিকে আবিষ্কার, বিচার ও তার জন্য প্রয়োজনমত প্রযুক্তির প্রয়োজনে যে স্থৈর্য, যে শান্তচিত্ততা, যে শ্রদ্ধা ও যে কর্মনিষ্ঠা প্রয়োজন তার একান্ত অভাব ছিল সেদিন। তাই বা কেন? সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনি আছে।

ছয়

ভগ্ন দেবমূর্তির মত সমাজের তৎকালিক মূর্তিকে তিনি পদ্মাবক্ষে বাসের কালে প্রতিদিন দেখেছেন এবং তার প্রতিকারের কথা চিন্তা করেছেন। সামগ্রিকভাবে দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে প্রতিকার হবে না তাও তিনি বুঝেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যে সাধনা—সাহিত্য-সরস্বতীর সাধনা—যা চিন্তা, মনন ও সেই চিন্তা ও মননকে রূপদানেই যার পরিপূর্তি—তার সঙ্গে এই প্রতিকারের কাজে কর্মের যোগ না করলেও চলত। কিন্তু মানব-চরিত্রের ও মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা লাভ যাঁর সাধনা, চিন্তা থেকে প্রয়োজনের সময় কর্মে না নেমে তাঁর পরিত্রাণ কোথায়?

মহাকবির স্বদেশ-চিন্তার মূলে রয়েছে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম। স্বদেশকে তিনি জাতির আত্মা বলে মনে করতেন এবং স্বদেশের সেবা করবার জন্য উপযুক্ত হবার প্রয়োজন আছে সে কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন।

এই মানসিকতার পটভূমিতে তাঁর পল্লীবাসের মধ্যে প্রতিদিন আশপাশের মানুষের জীবনে যে আত্মিক ও লৌকিক দুর্গতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে তাঁর ধ্যানের স্বদেশের দেবমূর্তির অঙ্গে আঘাত লেগেছে বলে অনুভব করেছেন। তাই সেই দেব-অঙ্গ থেকে আঘাত ও আবর্জনার কলঙ্কস্পর্শ দূর করা তিনি অবশ্য প্রয়োজন জ্ঞান করেছেন। শুধু দেশের বা সমাজের কল্যাণসাধন নয়, গ্লানিমোচন নয়, নিজের আত্মিক সাধনার সম্পূর্ণতাও নির্ভর করেছে এই কর্মের উপর।

সেই কারণেই শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করার জন্যই শ্রীনিকেতনের পত্তন। শ্রীনিকেতন ভিন্ন শান্তিনিকেতন সম্পূর্ণ হতে পারে না। এ সম্পর্কে তার নিজের কথাই উদ্ধৃত করি:

> আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল শিক্ষা ও পল্লী সংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।
>
> কর্ম উপলক্ষ্যে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে, লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষার জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কি রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।

একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মতো একটা আত্মবিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সংসদের সভাপতি পদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে তখনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলেম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হল। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবিকল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

[পল্লীপ্রকৃতি : শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে অভিভাষণ]

এই প্রচেষ্টার মূল স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করতে গিয়ে তিনি বললেন :

……রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরু-ভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্‌বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে, আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্যবিধানের প্রতিষ্ঠা।

[পল্লীপ্রকৃতি : তথৈব]

স্বাদেশিকতা সম্পর্কে তাঁর মূলগত ধারণার সঙ্গে তাঁর সমকালীন রাজনীতি-মুখী স্বাদেশিকতা ও আন্দোলনের মূলগত পার্থক্য ছিল বলেই সমকালীন রাজনীতির আদর্শ সম্পর্কে সহানুভূতি থাকলেও তার সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করতে পারেন নি। এবং এই পার্থক্যের কথাও তিনি অসংকোচে তাঁর রচনায় ব্যক্ত করেছেন :

সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জন-সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব—আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হাতে পারে, একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।

[কালান্তর : স্বরাজসাধন]

'অন্তরে বাহিরে এই আত্মকর্তৃত্বের চর্চার' যে অভাব তা তাঁর কল্পনালব্ধ কোন চিন্তা নয় ; অভিজ্ঞতালব্ধ বোধ। ভারতবর্ষের সমাজের মূল অন্তরমূর্তি ও তার উদ্দেশ্যকে তিনি প্রাথমিকভাবে জন্মসূত্রে লব্ধ বোধ এবং পরবর্তী কল্পনা, চিন্তা ও ধ্যান থেকে আবিষ্কার করেছিলেন, যার মূলে ছিল সমগ্র প্রেম—দেশের মানুষ ও মৃত্তিকার সম্মিলনে গঠিত

সমাজের প্রতি প্রেম। এই মূর্তি ও তার অভিপ্রায়কে তিনি ভগ্ন দেবমূর্তির মধ্যেই দেবতার অস্তিত্বের মত নিজের পল্লীবাসের সময় দেশের গভীর অভ্যন্তরে তার পল্লীসমাজের মর্মলোকে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত বলে দেখতে পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তার বিকৃতিও তাঁর দৃষ্টির অগোচর ছিল না। তাই দেশের অন্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও আনন্দের অভাবের অন্তরালে এই সমস্ত অভাবের মূল কারণ যে 'অন্তরে বাহিরে আত্মকর্তৃত্বের অভাব' তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর স্বাদেশিকতার মূল ধ্যানকে অটুট প্রত্যয়ে পরিণত করেছিল। এই প্রত্যয়ের জন্যই নিজের সমকালীন রাজনীতি ও আন্দোলন থেকে নিজেকে পৃথক রাখা সম্পূর্ণ অসংকোচেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

সাত

মহাকবি ধনীর সন্তান ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে, ঠাকুর-পরিবারের সন্তান হিসাবে তাঁদের বৃহৎ জমিদারী পরিচালনার দায়িত্বও তাঁকে বেশ কিছু কাল বহন করতে হয়েছিল। আমাদের যখন প্রথম যৌবন, যখন দেশ স্বাধীন হয় নি, যখন দেশে রাজনীতিক আন্দোলনের জোয়ার বইছে অথচ মহাকবি তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েও তার থেকে দূরে আছেন, সেই কালে মহাকবির সমাজের উচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত জীবনের সঙ্গে নিম্নতলবাসী সাধারণ মানুষের জীবনের যোগাযোগ নাই—এমনি ধরনের একটা কথা, একটা ধারণা শিক্ষিত সমাজে অর্ধবিশ্বাসের মত প্রচলিত ছিল; এবং সে কথা নিম্নকণ্ঠে কোথাও কোথাও উচ্চারিতও হত। বলা বাহুল্য তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অভিযোগের মৃদু সুর অনুপস্থিত থাকত না।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও স্বাদেশিকতা সংক্রান্ত রচনাগুলি, যা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে তাঁর জীবনের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘকালের মধ্যে রচিত, সেগুলির সঙ্গে যথাযথ পরিচয় হলে এ সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরসন হবে, এবং পাঠক একান্ত শ্রদ্ধা ও লজ্জিত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারবেন যে ধনীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও যে কোন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মানুষের চেয়ে দেশের সাধারণ মানুষ ও চাষী সম্পর্কে মহাকবির পরিচয় ও অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেকগুণ ভারী ও তীব্রতর ভাবে স্পষ্ট। পল্লীর মানুষ ও চাষী পরিবারের আর্থিক অবস্থা, তাদের অভ্যাস, তাদের চরিত্র ও চরিত্রের গড়ন সব তিনি বিশিষ্ট ও স্পষ্টভাবে জানতেন। তিনি চাষীর সম্পর্কে লক্ষ্য করেছেন, চাষী যখন চাষ করে তখনি সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে সে কাজ করে না, এ অপবাদ তাকে দেওয়া অন্যায় একথা তিনি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন। আমাদের দেশের চাষীর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সংকীর্ণ, চিত্ত ভীরু এবং সংস্কারগ্রস্ত এ তাঁরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। তিনি দেখেছেন চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এমনি যে তাতে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। অথচ একটা চিরাভ্যস্ত কাজের থেকে আর একটা ভিন্ন প্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা প্রয়োজন; সে সক্রিয়তা চাষের লাইন-বাঁধা কাজে থাকে না। বাংলা দেশের অন্তত দুটি জেলার চাষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে তিনি নিজেই দাবী করেছেন। এই অঞ্চলের চাষীদের অভ্যাসের বাঁধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তিনি দেখেছেন এক জেলা এক ফসলের দেশ যেখানে ধান ফলাতে চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তারপরে তারা তাদের ভিটের জমিতে অবসরকালে সবজি উৎপন্ন করতে পারত। এ নিয়ে তিনি তাদের যথেষ্ট উৎসাহও দিয়েছিলেন, কিন্তু ফল পান নি। যারা ধান-চাষের জন্যে প্রাণপণ করতে পারে তারা সবজি-চাষের জন্য নড়ে বসতে চায় না; ধানের লাইন থেকে তাদের মনকে সবজির লাইনে টেনে তোলা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম একথা তিনি ব্যক্তিগত বিস্ময়ের

সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। আর এক জেলার চাষী ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি সকল রকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু যে জমিতে এ-সব শস্য হয় না সহজে, সে জমি তাদের এমনি পড়ে থাকে, তার জন্য খাজনা বহন করে চলে তবু নিজের অভ্যাস ছেড়ে তাতে কিছু ফলাবার চেষ্টা করবে না। অথচ বৎসরে বৎসরে পশ্চিম অঞ্চল থেকে চাষী এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে নিয়ে দেশে ফেরে।

এসব মহাকবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর রায়ত সম্পর্কে আরও কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা আমি তাঁর রচনা থেকেই উদ্ধৃত করব। প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের 'রায়তের কথা' প্রকাশিত হবার পর, আজ থেকে চুয়াল্লিশ বৎসর আগে শ্রদ্ধেয় চৌধুরী মশায়কে তিনি লিখেছিলেন :

> আমি নিজে জমিদার, এইজন্যে হঠাৎ মনে হতে পারে আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা হলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি ; অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের হবে না।...
>
> আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন যোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে। 'রায়তের কথা'য় পুরাতন দপ্তর ঘেঁটে তুমি সেই সুখস্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেছ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্ছি ; রায়তদের বলছি 'প্রজা', তারা আমাদের বলছে 'রাজা'—মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয় ? কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব ? অন্য এক জমিদারকে ? গোলাম-চোর খেলার গোলাম যাকেই গছিয়ে দিই, তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠেকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব ? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারি নে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে ?...
>
> জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই ; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার টাকা আছে, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, একথা সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড

হতে থাকবে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্পসম্বল হবেই ; কাজেই অভাবের তাড়নায় খরিদ-বিক্রি বেড়েই চলবে। এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকী থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্বসমাসে তা আর টেকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রফা করতে বাধ্য করেছি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোন খেসারত পাবে কি না সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

... ...

মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে ধনি। তারা নিজেকে কোনোমতে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়তখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছরূপ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজ জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়িতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু, যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়।...

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের অনুকূল করে নেওয়াই মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে সেই আঘাতের দ্বারাই উল্টিয়ে মারা ওকালতি-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড়ো বড়ো পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ত যত দিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে তত দিন 'উচল' আইনও তার পক্ষে 'অগাধ জলে' পড়বার উপায় হবে।

এই কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো-আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে।...আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে ?...

আমি জানি, জমিদার নির্লোভ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা

আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশি আটক পড়ে।.....দেখতেদেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে তাতে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশি কড়া—যদি তাও না মানো এটা মানতে হবে, সেটা আর-একটা উপরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজ-সরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ববৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতি-স্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়-বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা জমির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে স্বাভাবিক উৎসাহের একটা মস্ত বাধা। সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছ কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এ-সব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো-একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কনগ্রেসে ভোট দেবার চার আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

[কালান্তর : রায়তের কথা]

অতি-দীর্ঘ উদ্ধৃতির জন্য আমাকে মার্জনা করবেন। কিন্তু আমি মনে করি, এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটির প্রয়োজন ছিল। দেশের সাধারণ মানুষের সমগ্র জীবনের প্রায় সবটাই আজকের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আজ থেকে চল্লিশ-চুয়াল্লিশ বছর আগে, ভূমি-নির্ভর ছিল। এই ভূমি-ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল ১৭৯৯ সালে ইংরেজ-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় জমিদার, রায়ত, তার মাঝখানে নানান ধরনের জমিদারী স্বত্ব ও উপস্বত্বভোগী নানা শ্রেণীর জমিদার ; তার সঙ্গে নানান শ্রেণীর মহাজন ; সব সমেত মিলে এক অতি জটিল ব্যবস্থা। যিনি এই জটিল ও বিচিত্র ব্যবস্থার সংগে বংশানুক্রমিকভাবে সাত পাকে বাঁধা না পড়ে এর হাজার ঘাটে জল না খেয়েছেন, তাঁর পক্ষে এই ব্যবস্থার হালহদ্দ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব বলেই মনে করি। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিত কেতাবী বিদ্যার আন্তরিক অভিজ্ঞতা দিয়ে একে বুঝলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে এই সহস্র গ্রন্থিতে গাঁথা, জটিল ব্যবস্থায় কোন্ গ্রন্থিতে কতখানি ব্যথা, কতখানি সুখ, কতখানি ছলনা, কতখানি ধূর্ততা, কতখানি শুভবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি আবদ্ধ মানুষটিকে পীড়ণ করেছে তা সঠিক উপলব্ধি করা অসম্ভব। আর যিনি এই ব্যবস্থার মধ্যস্থলের জীব, জমিদার মহাজন বা রায়ত যাই হোন, তাঁর পক্ষেও একে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা তো আরও অসম্ভব। কারণ নিজের অবস্থা ও দৃষ্টি দিয়ে বিচার করার ফলে নিজের স্বার্থই তাঁকে বার বার ছলনা করে যা বুঝাবে তা সম্পূর্ণ সত্যের থেকে অনেক দূরের পদার্থ। কাজেই এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও যিনি এর সম্পর্কে স্বার্থহীন সানুকম্প উদার দৃষ্টি অব্যাহত রাখতে পেরেছেন তিনিই এ সম্পর্কে সঠিক কথা শোনাতে পারেন। বলাই বাহুল্য, সেই দৃষ্টিই দেশের সাধারণ মানুষ যে রায়তের মূর্তিতে, প্রজার মূর্তিতে এই ব্যবস্থার অঙ্গীভূত ছিল তাদের সঠিক অবস্থাকে উন্মোচিত করে দেখাতে পারে।

মহাকবি আপনার সাধনার গুণে এবং অভিজ্ঞতার আনুকূল্যে সেই দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তিনি জন্মসূত্রে জমিদারের কর্ম সাময়িকভাবে করলেও, তিনি, তাঁর কথামতই, আসলে ছিলেন আসমানদার। তাই কর্মে জমিদারী করলেও মর্মে জমিদারী বৃত্তি ও প্রবৃত্তি প্রবেশাধিকার পায় নি। কর্মের সুযোগে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়েছে এ বিষয়ে; আর মর্মের চরিত্রগুণে রায়তরূপী দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের অসহায় বেদনা ও দুঃখের সর্বপ্রকারের মূর্তিকে অনুভব করে অসীম মমতার সঙ্গে হৃদয়ে অক্ষয় বেদনার মত ধারণ করে রেখেছিলেন। উপলব্ধির সঙ্গে বেদনার মণিকাঞ্চন যোগে তাঁকে তাই রায়তের স্বার্থ সম্পর্কে ভিন্ন কথা উচ্চারণ করিয়েছিল। আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন জমি যে চাষ করে তারই হওয়া উচিত। বুদ্ধিগতভাবে একমত হয়েও রায়তের প্রতি সহানুভূতি ও মমতাবশতই পুরোপুরি এ কথা মানতে তাঁর দ্বিধা এসেছে। বুদ্ধিতে দুর্বল, অর্থশক্তিতে সম্বলহীন রায়তের নিঃসহায় অবস্থার কথা ভেবে তাঁর যে যুক্তি যে জমি চাষ করে তারই—এই প্রাথমিক প্রতিপাদ্যকে মেনে নিয়েছে সেই যুক্তিকেই তাঁর প্রবলতর মমতা করুণ মুখে প্রশ্ন করেছে—জমির উপর প্রজার ষোল আনা অধিকার মানেই প্রজার জমি হস্তান্তর করার অধিকারও স্বীকার করে নেওয়া; যা তিনি নির্ভুলভাবে জানতেন প্রজার পক্ষে তৎকালে আত্মহত্যার অধিকার পাওয়াই হবে। তাই একে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেন নি। তবে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তার আবশ্যিক আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করাই শ্রেয় বলে মনে করেছেন।

আজ কালধর্মে জমিদার, মহাজন ও রায়তের মধ্যে জমিদার-ভূত কালের প্রাণীতে পরিণত। বাকি শুধু মহাজন ও রায়ত। আজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটেছে; জমিদারী বিলুপ্তির পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শ্রাদ্ধবাসরের অন্তে আমাদের সম্মুখের চলমান কালের নাটক মুখর ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মহাজনের যে আধুনিক মূর্তি জোতদার, সেই জোতদার ও রায়ত আজ সেই নাটকের মুখ্য দুই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। জমিদারী ব্যবস্থা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে, গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে যা যা উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলি আজ সব স্তরে স্তরে ইতিহাসের পূর্বলিখিত পৃষ্ঠার মত উন্মোচিত হয়ে চলেছে। রায়ত আজ সম্পূর্ণভাবে স্ব-কর্ষিত মৃত্তিকার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

আট

একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি এই জটিল সমস্যাকে রায়তের দৃষ্টি দিয়েই দেখেছিলেন এবং সমস্যাটিকে তার পূর্ণ মূর্তিতেই চিনতেন। যে ধাতুগত সাধনা ও হৃদ্‌গত মমতা জমিদার রবীন্দ্রনাথকে রায়তের চোখ দিয়ে সমস্যাটিকে দেখতে শিখিয়েছিল সেই তাঁকে ওইখানেই থামতে দেয় নি, আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এই কুম্ভীপাক থেকে মুক্তির পথসন্ধানে। 'রায়তের কথা'র শেষ অংশে তাই তিনি উচ্চারণ করলেন:

> কেমন করে সেটা হবে সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানি নে—জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে।

স্বদেশের যে মূর্তিকে সমাজের মধ্যে তিনি প্রকট দেখেছেন তার বাঁচবার পথও তিনি চিন্তা, পড়াশুনো ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—এই তিনের মধ্য দিয়ে অভ্রান্তভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। তার বাঁচবার যে শক্তি তা নিহিত আছে সমাজের জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে,

বিচ্ছিন্ন কোন অংশে বা বিশেষ কোন কর্মের মধ্যে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলেই তা সম্ভব। আর পল্লীর সামগ্রিক প্রাণসঞ্চার সামগ্রিক আত্মউদ্‌বোধনের মধ্যে, উদ্‌বুদ্ধ আত্মশক্তির মধ্যেই নির্ভুলভাবে নিহিত। সে আত্ম-উদ্‌বোধনের অর্থ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুই অংশের একসঙ্গে উদ্‌বোধন।

এরই জন্য শ্রীনিকেতনে হাতে-কলমে কাজের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা হয়েছে। আবার এই চিন্তা ও কর্মের রূপ কেমন হবে বা হতে পারে তার ভাবনা তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। প্রাণকে জড়ত্ব থেকে উদ্‌বোধনের জন্য যে প্রাণ পর্যন্ত পণ করার প্রয়োজন হতে পারে তাও বলেছেন তিনি। সেই বহুসংখ্যক রচনার মধ্যে, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে একটি অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না! এতো বড় আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে?

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে হয়। আমিই বলি, আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপাদিত্য। দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল, তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ—সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেঁচে থাক।

[তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

জীবনের বহিরঙ্গ সর্ববিধ অভাবে জর্জর, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অন্তরে ভীরু, অসহায়, দুর্বল দেশবাসীর সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় তাদের পূর্ণ উদ্‌বোধনের দ্বারা আত্মশক্তিতে, প্রতিষ্ঠা লাভের স্বপ্নকে মহাকবি আজীবন মন্ত্রজপের মত নিরন্তর চিন্তা করেছেন। সেইখানেই তার শেষ হয় নি। তাদের বাইরের ও ভিতরের অভাব ও দৈন্য দূর করবার কামনায় যতটুকু পারেন কাজে হাত লাগিয়েছেন। নিজের সীমিত সঙ্গতি ও কর্মের সংকীর্ণ পরিধির কথা জেনেও কাজে হাত না দিয়ে পারেন নি। সম্পূর্ণই জানতেন যে আলো জ্বলবে কি না কে জানে, আর জ্বললেও তার শিখায় অতি যৎসামান্য অন্ধকার বিদূরিত হবে। তবে মনে অশেষ এই আশা ছিল যে, কোথাও কোনও এক কোণের অন্ধকারও তো দূর হবে!

তাই সেই আলো জ্বালার কাজে কলম রেখে হাত লাগিয়েছেন। জ্বালা আলোর কম্পিত শিখাটিকে প্রতিকূলতার ঝোড়ো বাতাস থেকে আড়াল করে বাঁচাতে চেয়েছেন।

কিন্তু কেন?

সারা জীবন মনে পড়েছে পীড়িত দেখা-অদেখা কোটি মানুষের মুখ, অভাবে শীর্ণ, ভীরুতায় সকরুণ, অজস্র পীড়নে অসহায় ও ভয়ার্ত। সেই বেদনা সারা জীবন তাঁকে ব্যথিত করে রেখেছে। বোধ হয় সুগভীর স্নেহে, আকুল মমতায় তাদের সকলের সব ব্যথা নিজের বুকে কেড়ে নেবার সুতীব্র কামনা জেগেছে। তাই কাজে হাত দিয়েও মনে হয়েছে এ কতটুকু! তাদের সবারই মুখ মনে পড়ে হতাশার মর্মযাতনা ভোগ করেছেন। বুঝেছেন প্রয়োজন অনেক অনেক বেশী।

স্বদেশের সব পীড়িত মানুষের সব দুঃখ এক নিমেষে নিঃশেষে মুছে নিতে পারলে যাঁর পরিতৃপ্তি হ'ত, কিন্তু দেশের মানুষের দুঃখকে অশেষ বলে দেখতে পেয়ে যাঁকে সারাজীবন অপরিতৃপ্ত থাকতে হয়েছে, সেই স্বদেশ ও সমাজ-প্রেমিক মহাকবি দেশের মানুষ ও মৃত্তিকার যুগল সম্মিলনে রচিত স্বদেশের সমাজের সম্মুখে একান্ত নম্র ক্ষমা-প্রার্থনার জন্যই যেন সকরুণ কাতরতার সঙ্গে জোড় হাতে প্রণাম নিবেদন করে বলেছেন ঃ

অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা—
তবু জানি নে যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে—
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা॥

তাঁর সুবৃহৎ, সুবিশাল ও সুদূরপ্রসারী স্বদেশ-চিন্তার মধ্যে তাঁর মনটিকে বুঝতে যদি কারও ভুল হয়, তাঁর এই সকরুণ, নম্র, কাতর আক্ষেপের তীব্রতার মধ্যে তাঁর মনটিকে চিনতে নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি ঘটবে না।

চতুর্থ বক্তৃতা

রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীপ্রকৃতি

এক

আমাদের প্রতিদিনের প্রাণযাত্রায় এই বৃহৎ পৃথিবীর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমরা সচরাচর স্পর্শ করি, সেই কারণেই আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা সেই সামান্য ক্ষুদ্র অংশ থেকেই সংগৃহীত হয়ে আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। একান্ত জীবযাত্রার প্রয়োজনে যে জীবন শুধুমাত্র আপনার বাঁচবার রসদ সংগ্রহে ব্যাপৃত, তার প্রয়োজন সীমিত থাকে কলকোলাহলময় মানুষের কর্মব্যস্ত সংসারের একটি সামান্য অংশে। সে পৃথিবী মানুষের কলকাকলিতে মুখর, কর্মের প্রেরণায় ও তাড়নায় চঞ্চল, উত্তপ্ত ও উন্মত্ত; তার সঞ্চয়ের পরিমাপ হয় অর্থমূল্যে। সে জীবন অতি বিচিত্র, অতি দুর্বার, অতি বেগবান।

কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত প্রাণযাত্রার সীমানার ঠিক ওপারেই, কখনও বা তারই মধ্যে, আর এক প্রাণলীলার জগৎ সুদূর আকাশের নক্ষত্রলোক পর্যন্ত প্রসারিত। তা আমাদের প্রতি দিনের কাজে বড় একটা লাগে না। তাই তার অস্তিত্বই আমরা ভুলে থাকি। শুধু তাই নয়, মর্ত্যলোকের মৃত্তিকা থেকে দুরান্ত জ্যোতিষ্কলোক পর্যন্ত বিস্তৃত এই জগৎ যেন আমাদের তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেও দিতে চায় না। তার মধ্যে নিত্যকালের প্রাণলীলা বিধৃত, সে অনন্তব্যাপ্ত, অথচ সে একান্ত নিঃশব্দ, নির্বাক ও মূক। সে যেন আমাদের একান্ত সান্নিধ্যে থেকেও অহরহ নিজের অস্তিত্বকে গোপন করবার জন্যই পাষাণ মূর্তির মত নিজেকে নিশ্চল রেখে প্রচ্ছন্ন রেখেছে। তার দিকে চকিত অনভ্যস্ত দৃষ্টি পড়লে মনে হয়, সে পাষাণ পদার্থ মাত্র।

কিন্তু সেই অনন্ত-প্রসারিত নিত্যকালের প্রাণলীলা আমাদের জীবযাত্রার মতই চঞ্চল ও স্পন্দমান। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আমাদের চারিপাশের বাস্তব পৃথিবীর কর্মচঞ্চলতার সঙ্গে তার বাইরের অজানিত, নির্বাক পৃথিবী একযোগে যুক্ত হলে তবেই পৃথিবীর মানব-চেতনায় ব্রহ্মাণ্ডের মূর্তিটি সম্পূর্ণ হয়। মানব-চেতনার সম্মুখে এই সৃষ্টি পৃথিবী থেকে অনন্তলোক পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে সবুজ ফুল-তোলা, জ্যোতি বিন্দুর বুটি-বসানো, নীলাম্বের রঙে রঙীন, অনন্ত নৈঃশব্দের এক যবনিকার মত, যার প্রান্তে প্রান্তে এই মর্ত্যজীবনের মুখরতা আর চাঞ্চল্য জরির পাড়ের মত বসানো। মানুষের মুখরতা আর চাঞ্চল্যের পাড়টি সেই অনন্ত নৈঃশব্দের যবনিকার থেকে পৃথক করে দেখলে কোনটিই সৃষ্টির সম্পূর্ণ মূর্তি হবে না। দুইকে এক করে একসঙ্গে দেখলে তবেই দুইয়ের পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি হতে পারে।

অথচ মানব-চেতনায় এই দুইকে পৃথক করে দেখারই রেওয়াজ। যাঁরা এই অস্তিত্বের আস্বাদ আমাদের কাছে চিরকালের সামগ্রী করে বহন করে নিয়ে আসেন, সেই শিল্পীদের মধ্যেও কেউ বা এই পাড়ের কথা বলেছেন, কদাচিৎ কেউ এই পাড়হীন কাপড়খানির কথা, এই দুই ভিন্নের আস্বাদ ভিন্ন ভাবেই আমাদের দিয়েছেন; কেউ এটা দিয়েছেন, কেউ বা অন্যটা দিয়েছেন। কেউ বা এই মুখরতা ও চঞ্চলতার কবি, কেউ বা এই নৈঃশব্দের কাব্য রচনা করেছেন। কেউ বা কবি মানব-হৃদয়ের, কেউ বা কবি প্রকৃতি-চরিত্রের।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে মানব-হৃদয়ের এক কবি কথাশিল্পীর রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ঃ

বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশী উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশী হইল। বলিল, 'কি কি নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফেলা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চান্দ উঠবো, আলোয় পথটুকু পার হমু।'

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ উঠবো পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'

'সদর। ঘাটে না চুরি করুম। বিয়ানে ছিপাতিপুরের জংলার মধ্যি ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।'

পায়ের ঘা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা এক সময় দাঁড়াইয়া পাড়িল। বলিল, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস, পাঁচী?'

'হ, ব্যথা জানায়।'

'পিঠে চাপামু?'

'পারবি ক্যান?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথে দু দিকে ধানের খেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

[প্রাগৈতিহাসিক ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়]

এ কাব্য একান্তভাবে প্রকৃতি-নিরপেক্ষ মানব-হৃদয়ের। একটি মানব-দম্পতির একান্ত দেহের আধারে রচিত এক তীব্র তীক্ষ্ণ কাব্য-কাহিনী। পৃথিবীতে মানব-হৃদয়ের শিল্পী ও কবির সংখ্যাই সমধিক। তার কারণও একান্ত স্পষ্ট। চারিপাশের ছড়ানো মানব-জীবন থেকেই তাঁরা শিল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তার বাইরে তাকাবার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি কোনোটাই হয় নি তাঁদের।

আর এক শ্রেণীর স্রষ্টা আছেন যাঁরা ধাতুগতভাবে মানব-জীবনের প্রাণচঞ্চলতা, মুখরতা কোলাহল ও জনারণ্যের মধ্যে অবস্থান করেও এই সব কিছুকে ছাড়িয়ে বা আত্মিক সম্পর্ক-শূন্য হয়ে এই প্রাণচঞ্চলতা, কোলাহল ও মুখরতার বাইরে যে নিঃশব্দ নির্বাক পৃথিবী তারই সঙ্গী, তারই অধিবাসী। এ যেন হয়েছেন তাঁরা বিচিত্রভাবে—জন্মসূত্রে। তাঁরা আপনার মনের ও প্রাণের স্থায়ী আবাসস্থল আবিষ্কার করেন ওই বিপুল-বিস্তার মৌন নির্বাকের মধ্যে। এ এক ধরনের মানব-প্রবৃত্তির উজানে বয়ে যাওয়া যেন। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে এমন দুজন শিল্পীর রচনা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি আপনাদের আস্বাদনের জন্য পরিবেশন করছি ঃ

এক ॥

এতক্ষণে তাদের বনে-ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্ কিচ্ করিয়া পাখি ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট নিঃশব্দ, শান্ত বৈকাল—সেই হলদে পাখিটা আজও আসিয়া পাঁচিলের উপরের কঞ্চির ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোঁতা লেবুচারাটাতে হয়তো এতদিন লেবু ফলিতেছে।...

আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাঁঝ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে।...কেহ কোন দিন সে দিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া, মায়ের সে লেবুগাছটার সন্ধান কেহ কোন দিন জানিবে না, ওড়ুকলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলুদে-ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।

[পথের পাঁচালী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দুই ॥

সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা ;
খড় মুখে নিয়ে এক শালিক যেতেছে উড়ে চুপে ;
গোরুর গাড়ীটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে ;
পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে ;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে ;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

[রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ দাশ]

এই দুই ক্ষেত্রে কোলাহল-মুখর মানবজীবনের বাইরে পরিকীর্ণ যে নিঃশব্দ পৃথিবী, মাটি জল গাছপালা থেকে আকাশ ও জ্যোতির্লোক পর্যন্ত প্রসারিত যে নিঃশব্দ অস্তিত্ব তার কাব্যই শুধু এঁরা রচনা করেন নি, এঁদের রচনার চারিত্র্য বিচার করলে দেখা যাবে যে এঁরা এরই মধ্যে প্রাণের স্থায়ী ও অনন্ত আরাম আস্বাদ করেছেন। যে মানব-গৃহে এঁরা জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন সেই মানব-গৃহে মানবী-জননীর স্নেহে-সমাদরে তাঁদের স্থূল দেহটি লালিত হয়েছে, কিন্তু মন ও প্রাণটির পুনর্জন্ম হয়েছে এই অনন্ত রূপময়ী, মূক, অবজ্ঞাত ও অন্য-অজ্ঞাত প্রকৃতির সূতিকাগৃহে এবং তারই স্নেহে তাঁদের মন ও প্রাণ লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে তাঁরা প্রাণের এ জন্মের আরাম ও জন্মজন্মান্তরের ভুলে-যাওয়া চিরস্থায়ী আবাসকে খুঁজে পেয়েছেন।

কিন্তু তাতে অন্য দিকটি বাদ পড়ে গিয়েছে। কোলাহলময় মানবলোককে তাঁরা পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। কেবল মানবলোক থেকে, প্রাত্যহিক জীবন থেকে, মানবচিত্তের ও মানব-চরিত্রের সব ফেলে দিয়ে শুধু সেই সব বৃত্তি বা আবেগ বা অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে গিয়েছেন যা তাঁদের শ্রেয় আত্মিক আবাস অলংকরণ ও রঞ্জনের প্রয়োজনে প্রয়োজন। বাকীগুলিকে বর্জন করে গিয়েছেন।

দুই

কিন্তু আমাদের মহাকবির দৃষ্টি ভিন্ন শ্রেণীর। তিনি এই কোলাহলমুখর মানবজীবনের মাঝখানেই জন্মেছিলেন, এইখানেই, এই ভূমিতেই আপনার জীবনব্যাপী সাধনার স্থির আসন পেতেছিলেন এবং এই ভূমিতে অবস্থান করেই সমগ্রের সাধনা করেছিলেন। কোলাহলমুখরতার মধ্যে অবস্থান করেও তাঁর দৃষ্টি এই মানব-লোকের দ্বারা মাত্র সীমাবদ্ধ হয় নি, তা স্থির ও ধ্রুবভাবেই চিরকাল যুক্ত ছিল কলরব-মুখরিত জীবনের প্রাঙ্গণ থেকে দূরতম জ্যোতিষ্কলোকের মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্যন্ত। তাই তাঁর পৃথিবী অনন্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, এবং সেই অনন্ত প্রসারিত সংসারকে নিত্যউৎসবময় রূপে নিরীক্ষণ করতেন তাঁর বিচিত্র দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর অগণিত গানে জ্যোতিষ্কলোকের অজস্র, একান্ত সহজ উপমা এই অভিজ্ঞতার স্বাক্ষ্য বহন করছে। এই নিত্যউৎসবময় সংসারে, 'সুন্দর ভুবনের মাঝখানে, মানবের মাঝে' তিনি বসে এই অনন্তপ্রসারিত নিত্যউৎসবের আনন্দধারা পান করছেন।

তাঁর এই আনন্দ আস্বাদ, আমার যত দূর মনে হয়েছে, মোটামুটি দুই ধরণের মনোভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এক প্রত্যক্ষ রূপকে আস্বাদের আনন্দ-অভিজ্ঞতা, অন্যটি রূপকে অবলম্বন করে সৌন্দর্যমাধুরীলব্ধ ধ্যানের তন্ময়তা থেকে আনন্দ-আস্বাদের অভিজ্ঞতা। চরিত্রে প্রথমটি প্রধানত লৌকিক, দ্বিতীয়টি চরিত্রে মূলত আত্মিক। লৌকিক রূপময়তায় আত্মিক স্পর্শ লেগেছে কোথাও, আবার কোথাও আনন্দময়তা রূপকে অবলম্বন করে মূর্ত হয়ে উঠে আত্মাকে ধ্যানমগ্ন করেছে। আনন্দাস্বাদ ব্রহ্মস্বাদসহোদরঃ। এই রূপপ্রধান ও আনন্দপ্রধান স্বরূপের দুটি নমুনা আপনাদের আস্বাদের জন্য পরিবেশন করছি ঃ

এক ॥

আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো ; সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। ভাঙা উচ্চতীর ;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটির ;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মতো।

[সুখ ঃ চিত্রা]

দুই ॥

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্দ্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।

হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তুই দিতেছে নিঃশব্দে করতালি।

[১৪নং কবিতা ; জন্মদিন]

প্রথমটিতে পরিপূর্ণ রূপময়তা আনন্দের স্পর্শ বহন করে প্রকাশিত আর দ্বিতীয়টিতে আনন্দময়তা শরতের সোনালি আলোয় স্নাত হলদে ফুলের মতই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

বর্তমান আলোচনায় আমার আলোচনার বিষয় পল্লীপ্রকৃতি ; সেই কারণে আমি আমার বক্তব্য পল্লীপ্রকৃতির রূপময় প্রকাশের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি।

তিন

পূর্বে বলেছি, মহাকবি কোলাহলমুখর, কর্মচঞ্চল মানবজীবনের মাঝখানে জীবনের ধ্রুব আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই অতি-বাস্তব ও চঞ্চল-মুখর জীবনের বহির্দেশে নিত্যকাল অনন্ত-প্রসারিত নিঃশব্দ, নির্বাক জীবনের সঙ্গে চিরকাল আপনার কাব্য-চেতনার মধ্যে গ্রন্থিবদ্ধ ছিলেন। সেই কারণে প্রকৃতি-অভিমুখী ও প্রকৃতি-প্রেমিক অন্যান্য শিল্পীদের মত মানব-অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ প্রকৃতির মূর্তি ও প্রেম প্রকাশিত হয় নি। তাঁর প্রকৃতির ধ্যানের মাঝখানে সব সময় মানুষের ধ্রুব আসন পাতা থাকত। প্রকৃতির মূর্তি তাঁর শিল্পে তাই সর্বদা মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধনে যুক্ত। এই বোধকে ও প্রবণতাকে তিনি তাঁর কবি-জীবনের প্রায় প্রারম্ভেই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর তরুণ কালের রচনা কড়ি ও কোমলের প্রথম কবিতাটিতে তিনি আপনার কবিচিত্তের প্রবণতা আবিষ্কার করে উচ্চারণ করেছিলেন :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

[প্রাণ : কড়ি ও কোমল]

পরিপূর্ণ মানব-অস্তিত্বের যে ধ্যান ও বোধ তিনি লাভ করেছিলেন তাতে নিজের কবিশক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষকে বাদ দিয়ে প্রকৃতি বিগ্রহহীন শূন্য সিংহাসনের মত ; আর প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মানব অস্তিত্ব সিংহাসন-মহিমাহীন বিগ্রহের মত। তাই সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্য, শোভা ও মহিমামণ্ডিত প্রকৃতির সিংহাসনে তিনি মানব-বিগ্রহকে স্থাপন করেছিলেন। দুইয়ে একত্রিত ও যুক্ত হলে তবেই মানব-অস্তিত্বের পরি-পূর্ণ প্রকাশ। মহাকবির শিল্প-চেতনায় এ কোন পূর্ব পরিকল্পনা নয়। এ বোধটি প্রথম থেকেই তাঁর কাব্য-চেতনায় নিহিত ছিল ; প্রথমে অস্ফুট অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তা পরিস্ফুট হয়ে দিনে দিনে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী শিল্প-সাধনার মধ্যে তার প্রকাশ সুস্পষ্ট। 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'পূরবী' পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘকালের মধ্যে এর প্রকাশ লক্ষণীয় :

এক ॥

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেল চলে,
রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।

স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ-বিদ্যুৎ-আলো নাচে।
জুঁই সরোবরতীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
অতি মৃদু হাসি তার, বরষার বৃষ্টিধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
... ...
ভাবিতেছে মনে মনে কোথা কোন্ উপবনে
কী ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা, একটু দেছে কি দেখা
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।

[যোগিয়া : কড়ি ও কোমল ১২৯৩]

দুই ॥

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।
সেই মতো আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্তকাননে
কোনো এক কোণে
এক বেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি —
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

[১৪ সংখ্যক কবিতা : বলাকা ১৩২১]

তিন ॥

দুজনের সেই বাণী
কানাকানি
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা ;
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা।
তারপরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।

দেখাশুনা হল হারা
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর ;

[পূর্ণতা : পূরবী ১৩৩১]

কবি-জীবনের প্রথম কাল থেকে একান্ত পরিণত কবি-কর্মের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত মহাকবির কবি-কৃতির আলোচনা করলে দেখা যাবে, যে সব কবিতায় তিনি পল্লীজীবনের লৌকিক চিত্র এঁকেছেন সে অভিজ্ঞতা, বলা বাহুল্য, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ভিন্নতর আনন্দ-আস্বাদের উচ্চ ভূমিতে উত্তরিত হয়েছে—তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর কল্পনার একটি বিশেষ গড়নের আভাস পাওয়া যায়। অজস্র ও অফুরন্ত ঐশ্বর্য-সম্ভারের যে রাশি রাশি সম্পদ প্রকৃতি আমাদের অগোচরে একান্ত নিঃশব্দে আমাদের চতুর্দিকে থরে থরে নিত্যকাল ধরে অম্লান উপহারের সামগ্রী হিসাবে সজ্জিত করে আমাদেরই জন্য অপেক্ষা করছে, তারই মধ্যের কোন সামগ্রী কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। কবি সেই উপকরণ দিয়ে আপনার কল্পনার দোলমঞ্চ রচনা আরম্ভ করলেন একান্ত চারু রুচিতে। অপরূপ দোলমঞ্চ রচিত হয়ে প্রায় সম্পূর্ণ হল, কিন্তু পরিপূর্ণ হল না ; সেই মুহূর্তে সেই সজ্জিত মঞ্চের নেপথ্য থেকে হাত ধরাধরি করে এসে ঢুকল মানুষ আর মানবী, এসে তারা দুজনে বসল সেই মঞ্চের মাঝখানে ; অমনি কবির কল্পনায়, পাঠকের হৃদয়ে গান বেজে উঠল ; রসাপ্লুতচিত্ত পাঠক পরিতৃপ্ত হয়ে বলে উঠল, এইবার পরিপূর্ণ হয়েছে। মানুষে প্রকৃতিতে, প্রেমে সৌন্দর্যে মাখামাখি হয়ে পরম স্রষ্টার অমূর্ত পরিকল্পনাটিকে মর্তলোকে পূর্ণ প্রকাশিত করে তুলল।

রবীন্দ্র-প্রতিভার এইটি অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা। সৌভাগ্যক্রমে—সৌভাগ্যক্রমেই বলব, কারণ একে সৌভাগ্য ছাড়া আর কি বলতে পারি—মহাকবি জীবন সম্পর্কে এই সমগ্র দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। সাধারণত অধিকাংশ শিল্পীর জীবন ও দৃষ্টি, সাধারণ মানুষের মতই, খণ্ডিত হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত অভিজ্ঞতা মানব-লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে বলে অধিকাংশ শিল্পী মানব-জীবনের কবি ও কথাকার হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। আবার কেউ কেউ বা প্রবণতাগুণে প্রকৃতির রাজ্যেই নিজের আবাস সংগ্রহ করে নেন। যাঁরা প্রকৃতির মধ্যেই নিজের আবাস খুঁজে পান তাঁরা মানব-লোকের দিকে বড় একটা মুখ ফেরান না ; ফেরালেও সেখানকার ধূলামাটির রঙে রঞ্জিত না করে কাউকে তাঁরা তাঁদের ভাবরাজ্যে প্রবেশের অধিকার দেন না। মোট কথা, দুই ক্ষেত্রেই সেখানে জগৎ খণ্ডিত। মহাকবির কাছে জগৎ খণ্ডিত ছিল না ; তিনি সমগ্রকেই একেবারে লাভ করেছিলেন কবিসত্তার আবির্ভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতের সময়েই যে জগতের সঙ্গে তাঁর প্রথম শুভদৃষ্টি ঘটেছিল সে জগৎ মানবলোক ও প্রকৃতিলোক দুই মিলিয়ে সমগ্র জগৎ। আর সেই জগতের কেন্দ্রস্থলে যার স্থিতি সে মানুষ। তাই তাঁর কবিদৃষ্টি যেমন সামগ্রিক তেমন সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন আমাদের প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রতিমা গঠনের সময় দেবমূর্তিটি কেন্দ্রস্থলে রেখে তার চারিপাশে চালচিত্র করা হত, মহাকবির বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কেও তাই বলা যায় ; তাঁর ভাবজগতের কেন্দ্রস্থলে মানুষের বিগ্রহ, আর তার চারিপাশে প্রকৃতির সৌন্দর্যময়, মহিমান্বিত সজ্জা।

চার

যে প্রকৃতিকে মহাকবি মানবজীবনের মত সর্বত্রই দেখেছেন, তাকে স্বদেশে দেখেছেন, বিদেশে দেখেছেন ; তাকে নগরে দেখেছেন, পল্লীগ্রামে দেখেছেন। নগরে প্রধানত যেমন

মানবলোককেই পেয়েছেন তেমনি পল্লীতে প্রধানত প্রকৃতিকেই পেয়েছেন। এক জায়গায় প্রধানত মানুষের সান্নিধ্য, অন্যত্র প্রধান সান্নিধ্য প্রকৃতির। পল্লী অঞ্চলে তাই মানুষও প্রকৃতির অংশ। পল্লী অঞ্চলে নির্জনবাসের কালে রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি :

হেথায় তাহারে পাই কাছে—
যত কাছে ধরাতল যত কাছে ফুলফল—
যত কাছে বায়ু জল আছে।
যেমন পাখির গান, যেমন জলের তান,
যেমনি এ প্রভাতের আলো,
যেমনি এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা,
তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
যেমন সুন্দর সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা,
শুকতারা আকাশের ধারে,
যেমন সে অকলুষা শিশিরনির্মলা ঊষা
তেমনি সুন্দর হেরি তারে।
যেমন বৃষ্টির জল যেমন আকাশতল,
সুখসুপ্তি যেমন নিশার,
যেমন তটিনীনীর বটচ্ছায়া অটবীর
তেমনি সে মোর আপনার।
যেমন নয়ন ভরি অশ্রুজল পড়ে ঝরি
তেমনি সহজ মোর গীতি ;
যেমন রয়েছে প্রাণ ব্যাপ্ত করি মর্মস্থান
তেমনি রয়েছে তার প্রীতি। [পল্লীগ্রাম : চৈতালি]

এ এমন এক সংসার, যা নির্মল, সুন্দর, প্রশান্ত, নম্র, সহজ এবং বহু সমস্যার অস্তিত্ব সত্ত্বেও সমস্যাহীন। এ যেন এমন এক সংসার, যেখানে ঈশ্বর স্বর্গে অধিষ্ঠিত আর মর্তলোকে সবই নিয়মমত চলছে। পল্লীগ্রামের সব সমস্যাই মহাকবি জানতেন, সেখানকার দুঃখ দারিদ্র্য কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তা সত্ত্বেও নিত্যকালের প্রকৃতির পটে মানব জীবনের যে নির্মল, নম্র, সহজ, প্রশান্ত নিত্যমূর্তির প্রকাশ তা পল্লীর পরিবেশে স্পষ্টতর মূর্তিতে প্রকাশিত। সৃষ্টির সর্বত্রই এ রূপের অব্যাহত প্রকাশ ঘটছে, কিন্তু সর্বত্র তাকে স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে ধরা যায় না। যেখানে মানুষের প্রাণধারা অপেক্ষাকৃত কম মুখর বেশী নির্জন, যেখানে মানব-জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ ও দৃশ্যের মিলিত অস্তিত্বকেও চিনতে পারা যায়, সেই পল্লীর মধ্যেই একে আবিষ্কার করা সহজ। দৈনন্দিন মানব-জীবন, যা সেই বিশেষ দিনটির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সকল লাভ-ক্ষতি, মুখরতা-স্বার্থ, কোলাহল-কলরব নিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পরদিনের জন্য মানুষের হৃদয়ে কোন সঞ্চয় রেখে যায় না, সেই দৈনন্দিন মানব-জীবনের সঙ্গে মানব-জীবনের এই নিত্যমূর্তির সংযোগ না ঘটলে মানব-জীবন রসের যোগানে সরস ও পরিপূর্ণ এবং পরিপক্ক হয় না। সেই পরিপূর্ণতার সহজ উপকরণ তিনি পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে অনন্ত ভাণ্ডারের মত দেখতে পেয়েছিলেন এবং দেখাতে চেয়েছেন।

আমি যদিও মানব-জীবন ও প্রকৃতি এই দুইকে আমাদের সাধারণ ও সচরাচরের অভ্যাসবশত পৃথকভাবে বার বার উল্লেখ করেছি, মানব-অস্তিত্বের সমগ্রতার দৃষ্টিতে এ দুই কখনও বিচ্ছিন্ন নয় ; এ সর্বদা এক ও অবিভাজ্য। মহাকবির মানব-জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিও

সর্বদা সেই সমগ্রতাবোধের দ্বারা চিহ্নিত এবং তাঁর চেতনা সর্বদা এই সমগ্রতাবোধে সজাগ ছিল। দুইকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে দেখার দৃষ্টি তাঁর ছিল না। তবে জীবনের, চিন্তার ও শিল্পের প্রয়োজনবোধে সেই সমগ্রের বৃহৎ পরিধির এক এক স্থানে এক এক সময় চেতনার আলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই মাত্র। একের কথার সঙ্গে অন্যের কথা স্বতই এসে পড়েছে, একের আলোকিত মূর্তির পশ্চাতে অন্যের অস্তিত্ব সর্বদাই আভাসিত হয়েছে। মানুষ পল্লীর পরিবেশে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতরভাবে যুক্ত; শুধু তাই নয়, সেখানে সে বৃহৎ প্রকৃতির অংশমাত্র। শিল্পকর্ম নয়, মহাকবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অংশ নীচে নিবেদন করছি:

> শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন ভিজে দিন ভারী বিশ্রী লাগে। সকালবেলাটা তাই নিতান্ত নির্জীবের মত ছিলুম। বেলা দুটোর সময় রোদ উঠল। তারপর থেকে চমৎকার। খুব উঁচু পাড় বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয়—এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত—দুই ধারে স্নেহ সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি বেঁকে বেঁকে চলে গেছে—আমাদের বাংলা দেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে বসে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায়—তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।
>
> [ছিন্নপত্রাবলী: ১৪ সংখ্যক পত্র]

এ ছাড়া মোটামুটি ১২৯৮ সাল থেকে ১৩০৭ সাল পর্যন্ত রচিত গল্পগুচ্ছের কম বেশী পঞ্চাশটি গল্প এর সর্বশ্রেষ্ঠ চিহ্ন বহন করে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পৃথিবীর গল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে সবিনয়ে এ কথা বলতে পারি যে মানুষে প্রকৃতিতে মাখামাখির এমন রসময় স্বাদু অভিজ্ঞতা সাহিত্যের বৃহৎ ও উজ্জ্বল ইতিহাসে কমই আছে। নদীমাতৃক, শ্যামল, কোমল বাংলা দেশের নিভৃত অন্তঃপুর—সেখানে এক দিকে দূর দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র বা প্রান্তর, অন্য দিকে বিপুল-বিস্তার শুভ্র বালুকারাশি, মাঝখানে কলস্বরা খরস্রোতা পদ্মা ও তার বিভিন্ন জলধারার প্রবাহ; মাথার উপরে অনন্ত-বিস্তার আকাশ; নদীর দুই দিকে কোথাও দূরে ও কোথাও নিকটে আম-কাঠাল-বট-অশথ-শিরীষের প্রাচীন বনশোভার ভিতরে ও আড়ালে কোটোর মধ্যে বাংলাদেশের প্রাণভোমরের মত ঘনসন্নিবিষ্ট কুটিরের সমাবেশে বাংলার পল্লীগ্রাম। এই বৃহৎ, নিঃশব্দ, প্রশান্ত প্রকৃতির পটভূমি, যার দিকে সারা আকাশ সকলের অগোচরে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে, সেই শব্দহীন বৃহতের কোলে ছোট ছোট পুতুলের মত মানুষের সহজ ও জটিল জীবনের ছোট ছোট হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের লীলা।—যা বড়ই ছোট, যার উচ্চরোল এই বৃহৎ নৈঃশব্দকে সামান্যই বিঘ্নিত করে, যার সুখ-দুঃখ এই অনন্ত-বিস্তৃত উদাসীনতাকে সামান্যই স্পর্শ করে। জীবনের এমন সমগ্র মূর্তি শিল্প-অভিজ্ঞতার মধ্যে কদাচিৎ আস্বাদ করা যায়। এই ভীষণ নীরব, বিপুল-বিস্তার ব্রহ্মাণ্ডের পটভূমিতে কোলাহলময় মানব-জীবন যেমন অনুপাতে একান্ত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র, এবং একান্ত তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও যেমন তার বৈচিত্র্যের শেষ নাই, বিশাল পদ্মার দুই নিভৃত পল্লীর মানুষের ক্ষুদ্র, তুচ্ছ জীবনের দুঃখ-সুখের বৈচিত্র্যের তেমনি অবধি নাই। আবার এই ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়ে আবেগ ও প্রবৃত্তি পদ্মা-মেঘনার চেয়েও দুর্বার, প্রবল এবং দুস্তর। প্রকৃতির বিশাল ও নিভৃত পটভূমিতে মানব-আবেগের এই গল্পগুলি রচনার পর দীর্ঘকাল পার হয়ে গিয়েছে; তারপর থেকে পদ্মার অনেক জলধারা বয়ে গিয়েছে, দেশের ইতিহাসে এবং মানুষের মনে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু আকাশ ও মৃত্তিকার শুক্তির আবরণের মধ্যে বাংলা দেশের নিভৃত পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের যে লুকানো মুক্তা মহাকবি

শুক্তিপেটিকার আবরণের মধ্য থেকে আমাদের জন্য উদ্‌ঘাটন করে গিয়েছেন তা এখনও অম্লান লাবণ্যে ঝলমল করছে। নদীমাতৃক বাংলা দেশে জলের মধ্যে কতটা মাটি মেশানো আর মাটিতে জলের অংশ কতখানি তা নির্ণয় করা যেমন দুরূহ, তেমনি এই গল্পগুলিতে কতটা মানুষের মৌল আবেগ আর কতটা প্রকৃতির নিঃশব্দ ক্রিয়া আছে তার সীমারেখা টানাও তেমনি কঠিন। নীচের আশ্চর্য অংশটিতে এক অন্ধ বধূর অভিজ্ঞতা তার অপরূপ সাক্ষ্য বহন করছে ঃ

> অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারিদিক দেখিতে কি রকম তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভাবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশির-ভেজা নূতন চষা খেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনা-ঢালা অড়র এবং সরিষা-খেতের আকাশ-ভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন কি ভাঙা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া বসিল ; অন্ধ চক্ষু তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম, কেবল মাকে পাইলাম না। মনে মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদুকম্পিত প্রাচীন দুর্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের দেহতত্ত্বগান গুঞ্জনস্বরে শুনিতে পাইলাম না ; সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশির-স্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেঁকিশালে নূতন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোটো ছোটো পল্লীসঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা কোথা হইতে হাম্বাধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন ; সেই সঙ্গে ভিজা জাবনার ও খড়-জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শুনিতে পাই, পুকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ী হইতে কাঁসরঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার শিশুকালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটুকু গন্ধটুকু আমার চারিদিকে রাশীকৃত করিয়াছে।
>
> [দৃষ্টিদান ঃ গল্পগুচ্ছ]

এখানে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির চরম সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিদিনের প্রয়োজনের বাইরে যে বৃহৎ নিঃশব্দ সংসার, যাকে প্রকৃতি বলে উল্লেখ করেছি, সে তার সকল সম্ভার উদ্যত করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের দেনা-পাওনার সম্পর্কই আমাদের এত ব্যাপৃত করে রাখে, আমাদের ক্ষুদ্র, বস্তুনির্ভর ও নিকট-নির্ভর মন তাতেই এত নিমগ্ন থাকে যে আমরা সেই গণ্ডীর ওপারে তাকাই না। অথচ সে নিঃশব্দে দিয়েই যাচ্ছে, তার সব দেবার জন্যই যেন অপেক্ষা করছে। অথচ আমাদের তা খেয়ালে থাকে না। তাই দৈব-দুর্বিপাকে কোন দিন জীবনে বিপর্যয় নেমে এলে, যখন মানুষ হারিয়ে যায়, আর চাইলেও যখন মানুষকে পাওয়া যায় না, তখন যে চিরকাল নিঃশব্দে, অনন্ত ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে আছে ও থাকে আমাদের জন্য, সে সস্নেহে তার অনন্তবাহু বেষ্টন করে আমাদের জড়িয়ে ধরে। সেই তখন পরমাশ্বাসে আশ্বাস দেয়, সব অভাব পূরণ করবার চেষ্টা করে তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ও স্বাদের সম্ভার নিয়ে, সেই সম্ভারের স্মৃতি নিয়ে, মানব-জীবনের আদি অস্তিত্ব ও আদি আনন্দ যা

থেকে উদ্ভূত। উপরের উদ্ধৃতিতে একটি তরুণী পল্লীবধূ চিকিৎসার দোষে অন্ধ হয়ে যাবার পর, যখন বাইরের পৃথিবী তার কাছে হারিয়ে গেল তখন চিরকালের নিঃশব্দ প্রকৃতিই তাকে মায়ের মত তার সকল সান্ত্বনা ও সকল ঐশ্বর্য নিয়ে এসে স্মৃতি ও অনুভব দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে।

পাঁচ

জননী-স্বরূপা বাংলা দেশের অপরূপ স্নেহ-সজল মূর্তি মহাকবির দুই চোখ, চিত্তলোক এবং কল্পনাকে চিরকাল মুগ্ধ করে রেখেছিল। দেশের মাটির দিকে চোখ মেললেই তাঁর দুই চোখ মুগ্ধতায় আবিষ্ট হত; চোখ বন্ধ করলে তারই ছবি সমস্ত মনকে প্রেমে, সৌন্দর্যে ও রসে পরিপ্লুত করত। তাঁর সমস্ত জীবনের সুবৃহৎ রচনা-সম্ভার তার সাক্ষ্য সগৌরবে বহন করছে। তিনি পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে বার বার গিয়েছেন এই বিপুলা পৃথিবীর বহু বিচিত্র সৌন্দর্যকে আস্বাদন করেছেন। তাদের সেই বিচিত্র বার্তা তাঁর রচনার মধ্যে বিশেষ ধরা নেই। কারণ তাঁর বড় প্রেমের, বহু মুগ্ধতার আধার বাংলা দেশের প্রকৃতি তাঁকে চিরকাল তার সৌন্দর্য দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল, ভুলিয়ে রেখেছিল। বোধ হয় সে হৃদয়ে দ্বিতীয় কোন মূর্তির স্থান ছিল না।

এই বাংলা দেশের প্রকৃতিকে তিনি কত মূর্তিতেই না এঁকেছেন। বার বার তার ছবি, তার সৌন্দর্য এঁকেও যেন তাঁর কবিচিত্ত পরিতৃপ্ত হয় নাই। বার বার বোধ হয় মনে হয়েছে যা দেখেছেন তাকে বোধ হয় পুরো রূপ দেওয়া হয় নাই। তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে এই সৌন্দর্য-মূর্তির সহর্ষ প্রকাশ তাই স্বভাবতই অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে।

শুধু সৌন্দর্য-মূর্তি নয়, তার সঙ্গে ভাবমূর্তি। ভাবমূর্তি বলতে আমি সেই চিরন্তন মানব-ভাবনার কথাই বলতে চাচ্ছি—যে ভাবনায় এই বিশ্বের মানব-জীবন সাধনায় সেই পরম রহস্যকে আবিষ্কার করার তপস্যা আছে, আকুতি আছে, সেই রহস্যকে চকিতে স্পর্শের আনন্দ-স্বাদ আছে; যা নাকি বিশ্বমানবের মহত্তম অবিনশ্বর উত্তরাধিকার, যা আছে আমাদের দেশে বেদান্তে-উপনিষদে, যা আছে রামায়ণে-মহাভারতে ও বিশ্বের এই জাতীয় সাহিত্যে, সংগীতে সংস্কৃতিতে। সেই ভাবমূর্তিকেও তিনি বিচিত্রভাবে বাংলার পল্লীর জীবন-সাধনার মধ্যে, সংগীতের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন।

তারই কথা আমার বক্তৃতার শেষ কথা।

'অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা'। মহাকবিরই নিজের কথা। রবীন্দ্রনাথ অনেক নিয়েছেন পল্লীগ্রাম, পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীজীবন ও পল্লীসাধনা থেকে—এই কথাটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে সকলের কাছে। দিয়েছেন তিনি অনেক। তাঁর সমগ্র জীবন-সাধনাই দিয়ে গেছেন। যা নগর পেয়েছে তাই পল্লীও পেয়েছে। কিন্তু নিয়েছেন কি?

রবীন্দ্রনাথের সকল কীর্তিই অনন্যসাধারণ। তার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতই বোধ করি সর্বোত্তম। রবীন্দ্রসংগীত শুধু শিল্প নয়, রবীন্দ্রসংগীত একাধারে তাঁর জীবনসংগীত এবং সাধনাসংগীত। ভারতীয় মার্গসংগীত নিয়ে তাঁর সংগীত সাধনার শুরু হয়েছিল। ব্রহ্মসংগীত এবং কিছু প্রকৃতি নিয়ে, কিছু প্রেম নিয়ে, কিছু পূজা নিয়ে সংগীতও তাঁর মধ্যে আছে। কিন্তু তার বিচিত্র এবং পরমানন্দময় স্বতস্ফূর্ত উৎসার এবং প্রকাশ ঘটেছে বাংলার কীর্তনাঙ্গ, বাউল ও লোকসংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর।

ভারতজীবনের প্রাণধারা-স্বরূপিনী গঙ্গা যেমন বাংলায় ঢুকে ভাগীরথী ও পদ্মা দুইভাগে

বিভক্ত হয়ে গেছেন, ভারতীয় সংগীত বাংলায় তেমনি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। বাংলার লোকসংগীত ও মার্গসংগীত ভাগীরথীর মত এখানে স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। ভাবজগতের প্রকাশেও আশ্চর্য প্রভেদ ঘটেছে। বাংলার বাউল, কীর্তন ও শাক্তসংগীতের মধ্যে তা সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ এইখানে এসে সেই মহান সম্পদ-ভাণ্ডার, যা নাকি গুপ্তধনের ধনভাণ্ডারের মত, তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত পেয়েছিলেন এবং সেই ভাণ্ডারকে তিনি জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

যে মহাকবি ও জমিদার জমিদারী কাছারীতে পল্লীবালকদের মুখস্থকরা সংস্কৃতবহুল সাধুশব্দে রচিত বক্তৃতা শুনে বহুকষ্টে হাস্যসম্বরণ করেছিলেন, তিনিই লালন ফকীর, গগন হরকরা প্রভৃতিদের মত বাংলার বাউলদের কাছে তাদের গোপীযন্ত্র ও একতারা সহযোগে খাঁচার অচিন পাখীর আনাগোনার গান শুনে তার মধ্য থেকে—'যে দিন পড়বে না মোর চরণচিহ্ন এই বাটে' জাতীয় গান দিয়ে বাঙালীর জীবনকেই শুধু নয়, সমগ্র বাংলা দেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ; এবং এই গান গাইতে গাইতেই বাংলার পল্লীর মাটিতে পা রেখে আকাশে মাথা ঠেকিয়েছিলেন। বাংলার বাউল-সংস্কৃতি বাউল-সংগীত, কীর্তন গান, বৈষ্ণবকাব্য—যার মধ্যে হিন্দু সভ্যতার ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বার্তা কাল থেকে কালান্তরের নব রসায়নে এক অভিনব লোকায়ত মূর্তি নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অপেক্ষা করছিল—এই সব কিছু তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করেছিল এক অভিনব সম্পদের ভাণ্ডার। এই বাউল গান, বাউল-সংস্কৃতি, কীর্তনের সুর, বৈষ্ণবকাব্য তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যে নবজন্ম লাভ করেছে সেই নবজন্মেই বাংলা সাহিত্য অমৃতে পরিণত হয়েছে।

মহাকবির সমসাময়িক কীর্তিমানদের ও পূর্বসূরীদের শিল্পকর্মের পাশাপাশি তাঁর শিল্পকর্মকে স্থাপন করলেও এর প্রমাণ মিলবে। বলা বাহুল্য, এ আলোচনার উদ্দেশ্য অন্য কোন মহৎ শিল্পীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মহাকবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের চেষ্টা নয়, কেবলমাত্র শিল্প-চরিত্র বিশ্লেষণ করা। মহাকবি মধুসূদন বলতে গেলে তাঁর সমসাময়িক দেশ ও কাল থেকে সামান্যই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কবি-কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়েছিল পশ্চিমের এক মহাকবির কাব্যকীর্তি থেকে। তাঁর উদ্দীপ্ত কবি-কল্পনা তার রুচি অনুযায়ী আপনার কাব্যের অধিকাংশের আখ্যানভাগ সংগ্রহ করেছে আমাদের দুই মহৎ কোর গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত থেকে। ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনা ত্যাগ করে যে কবি 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' বলে মাতৃভাষার শরণ নিয়েছিলেন তিনিও একেবারে অলঙ্কারহীন ভাষায় কথা-বলা, সম্পদহীন, ঐশ্বর্যহীন সমসাময়িক বঙ্গজননীর কোলে ফিরে আসতে পারেন নি। তিনি যে দেশজননীর কোলে ফিরেছিলেন কল্পনারাজ্যে, তিনি আত্মিক সংস্কৃতি ও বাহ্যিক ঐশ্বর্য ও বীর্যের বহুতর অলঙ্কারে ভূষিতা, ঐশ্বর্যশালিনী প্রাচীন ভারতভূমি। ত্রিকালদর্শী ঋষিতুল্য বঙ্কিমচন্দ্র বার বার অতীত বঙ্গদেশ ও ইতিহাস, ঐশ্বর্যময় ভারতবর্ষের অন্যত্র ছুটে গিয়েছেন তাঁর কল্পনার নবতর ক্ষেত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। এত বড় দুজন মহান শিল্পীর দৃষ্টি বাংলার পল্লীর দিকে ঠিক নিবদ্ধ হয় নি। বৃহৎ দেশ সমগ্রভাবে যে পল্লীগ্রামে স্থাপিত তাঁরা সেই পল্লীগ্রামকে দিতে চেয়েছেন কিন্তু পল্লীর সংস্কৃতি-সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে চান নি বা তাঁদের যেন তার সুযোগ হয় নি।

এই গ্রহণ করবার ক্ষমতার উপরেই শিল্পীর শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ নিজের মাতৃভূমিকে এবং সমসাময়িক কালকে যেমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। নিজের কালকে, নিজের দেশকে, নিজের সমসাময়িক মানুষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার মূল্যেই এ আশ্চর্য ইন্দ্রজাল সম্ভব হয়েছে। তিনি আমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য যেমন তাঁর সুমহৎ গৌরব আছে তেমনি দেশের সমগ্রকে সপ্রেমে বুকে তুলে

নেওয়ার মধ্যে যে দ্বিগুণ গৌরব আছে এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। দেশের সমগ্রকে সম্পূর্ণ গ্রহণের গৌরবে গৌরবান্বিত মহাকবি আমাদের দ্বিগুণ শ্রদ্ধার পাত্র।

ছয়

আমার বয়স সত্তর পার হয়েছে; পৃথিবীর মূর্তি আমার কাছে আজ অনেক পরিমাণে ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে; দিনান্তের ঘণ্টার গভীর ধ্বনি যেন সকল কোলাহলের ওপার থেকে মধ্যে মধ্যে মনে এসে প্রতিধ্বনি তোলে। শেষ খেয়ায় পা বাড়াবার জন্য প্রস্তুত হবার দিন সমাগত। পুরনো বন্ধুরা, যাদের সঙ্গে সমসাময়িক কালে একই গ্রামের সীমানায় পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেছিলাম তাদের সকলেই প্রায় বিগত। শেষ জন যিনি ছিলেন তিনি আমার প্রিয়তম বাল্যবন্ধু এবং একান্ত পরমাত্মীয়। এবার শরতের প্রারম্ভেই তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ায় যোগ দিতে দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। শুধু বাইরের সামগ্রী গোছানো নয়, নিজের মনকেও প্রস্তুত করছি। এমনি সময়ে শরতের এক প্রভাতে অকস্মাৎ বাড়ির ভিতর থেকে কচি কলকণ্ঠে আবৃত্তি শুনতে পেলাম। কান পেতে শুনতেই বুঝলাম আমার পাঁচ বছরের পৌত্রী কলকণ্ঠে আবৃত্তি করছে:

আশ্বিনে হাট বসে
ভারী ধুম করে,
মহাজনি নৌকায়
ঘাট যায় ভরে।
হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি,
মহা সোরগোল—
পশ্চিমি মাল্লারা
বাজায় মাদোল।
বোঝা নিয়ে মন্থর
চলে গোরুগাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন
করে ডাক ছাড়ি।
কল্লোলে কোলাহলে
জাগে এক ধ্বনি
অন্ধের কণ্ঠের
গান আগমনী।
সেই গান মিলে যায়
দূর হতে দূরে
শরতের আকাশেতে
সোনা রোদ্দুরে।

[আগমনী : চিত্র বিচিত্র]

মুহূর্তে মন উজান বেয়ে আমার বালক কালের দিকে মুখ ফেরালে। সেই দিনই এক সুযোগে 'চিত্র বিচিত্রে'র কবিতাগুলি একবার উলটে দেখলাম। বাংলার পল্লীপ্রকৃতির রেখা-চিত্রগুলির পথ ধরে উজান-বাওয়া, বালক কালের দিকে মুখ-ফেরানো মন সোজা এগিয়ে চলল মনে মনে। হিমের পরশ-লাগা হাওয়ায়, ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা-ধরা পথ বেয়ে,

বুক-দুরুদুরু, কাঁপা আমলকী বনের পাশ দিয়ে, কুঁড়ি-ভরা শিউলীর ডালে হাত ছুঁয়ে, বর্ষণশেষে ছাড়া-পাওয়া মেঘের নীচে নীচে, ছুটির ছোঁয়াচ-লাগা সোনার আলোয় মন এগিয়ে চলল। যে তারাগুলি বাতি নিয়ে সারা রাত জেগে সকাল বেলা বেলফুল আর জুঁইফুল হয়ে নেমে এসেছিল তারা কবে মিলিয়ে গিয়েছে, তারা আর নেই। মন চলল এগিয়ে। আমাদের পাড়াখানি ছায়ার ঘোমটা টেনে পাশে পড়ে রইল ; পড়ে রইল চারিভিতে তালবন নিয়ে পাড়ার মাঝখানের দীঘিটি। চলতে চলতে শরৎ গেল, হেমন্ত গেল, শীতের ছোঁয়া লাগল। মন পেঁছে গেছে বক্‌শিগঞ্জে পদ্মাপারে যেখানে শুক্রবারে হাট বসেছে। সঙ্গে ভাগনে মদনকে নিয়ে কুমোরপাড়ার বংশীবদন কলসী-হাঁড়ি বোঝাই করে গোরুর গাড়ি নিয়ে চলেছে। হাট ছেড়ে ততক্ষণে পেঁছে গিয়েছে মন মোতি বিলের ধারে যার 'বহুদূর জল, হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল', 'পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে, মাছরাঙা ঝুপ করে পড়ে এসে জলে'। মোতি বিল ফেলে রেখে মন আবার ফিরে এল নিজের পাড়ায়, যেখানে 'ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ি, খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি' ; 'বিধু গয়লানি মায়-পোয়, সকাল বেলায় গোরু দোয়' ; 'আঙিনায় কানাই বলাই রাশি করে সরিষা কলাই' ; 'বড়ো বউ মেজো বউ মিলে ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে'। অঘ্রাণ সারা হয়েছে, নদীর ধারা স্বচ্ছ, শিরীষের পাতা ঝরতে শুরু করেছে ; 'ওপারে চরের মাঠে, কৃষাণেরা ধান কাটে, কাস্তে চালায় নতশিরে'। 'শুকনো খালের তলে, এক হাঁটু ডোবা জলে বাগদিনি শেওলায় পাঁকে', বুকে আঁচল এঁটে, জল ঘাঁটাঘাটি করে মাছ ধরে চুবড়িতে রাখে'। ওই দূরের রাস্তা দিয়ে, বউ চলেছে চৌগাঁয়ে, ঝি-বুড়ি চলেছে বাঁয়ে', বউয়ের পালকি কাপড়ে ঘেরা ; বেলা বেড়ে চলেছে, তাই হাঁই-হুঁই ডাক ছেড়ে বাহকেরা হন হন করে ছুটেছে। পৌষে মেলা বসেছে। 'শীতের দিনে নামল বাদল বসল তবু মেলা', 'বিকেল বেলা ভিড় জমেছে ভাঙল সকাল বেলা'। পথে দেখি, 'দু-তিন টুকরো কাঁচের চুড়ি রাঙা', 'তারি সঙ্গে চিত্র-করা মাটির পাত্র ভাঙা'। মন শীত পার হয়ে বসন্তের অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। ডিম ডিম রবে দুন্দুভি বেজে ওঠে, সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব। 'পূর্ণিমা চন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারায় সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়'। তারই গায়ে গায়ে 'ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল', 'ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল', 'চঞ্চল মৌমাছি গুঞ্জরি গায়' 'বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণা বায়'। বসন্তের সীমা শেষ হয়, মন এসে দাঁড়ায় বৈশাখের দিনে গ্রামের ছোট নদীটির ধারে। আমাদের সেই ছোট নদী যা চলে বাঁকে বাঁকে, 'বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে', 'পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি', 'দুই ধারে উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি'। সেখানে 'চিক্ চিক্ করে বালি কোথা নাই কাদা, সেখানে 'কিচ কিচ করে খালি শালিকের ঝাঁক', 'রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের ডাক'। তারপর একদিন বর্ষার ঝোড়ো রাত পার হয়ে গেল, বাদল-ধারা নামল, চন্দ্র তারা লুপ্ত হল, বাতাস থেকে থেকে আকাশকে হানা দিল। আবার এক শরতের দিনে মন ফিরে এসে দাঁড়াল গঞ্জের বাঁয়ে অঞ্জনা-নদীতীরে। সামনে সন্ধ্যা নামছে। সূর্যের অন্তিম আলো রক্তিম আকাশের শেষ কিনারায় হারিয়ে গেল ; সামনে সংগীতহীন অন্ধকার ; অনন্ত অন্ধকার !

মন আমার পাঁচ বছরের পৌত্রীর হাত ধরে যেন সমগ্র বাংলা আর সমগ্র ঋতুচক্র পরিক্রমা করে আবার অঞ্জনা নদীর তীরে এসে দাঁড়াল। ভুলে গিয়েছি যে আমি পরিণত-বয়স্ক মানুষ, আমি শিশু নই। কিন্তু সামনের প্রসারিত অন্ধকারের কথা আমাকে আবার আমার বাহাত্তর বৎসর বয়সে ফিরিয়ে আনলে। তবু একবার, জীবনের এই শেষ পর্বে মহাকবির চোখের মায়া অনুসরণ করে আমার শিশুকালের, আমার চিরকালের বাংলা দেশকে বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ফিরে পেলাম। এই মাটিতেই মহাকবির মত, আপনাদের মত আমারও জন্ম হয়েছে, এই দেশেরই আলো, বাতাস, গাছপালা, জলধারা, অন্ন আমার দেহমনকে লালন, পুষ্ট

ও শুশ্রূষা করেছে, এই মাটির মানুষদের ভালবাসায় কৃত-কৃতার্থ হয়েছি, এই ভাষাতে হেসেছি কেঁদেছি ; একান্ত দুঃখের দিনে, হতাশার মুহূর্তে এই আলো বাতাস মাটি আমাকে কোলে নিয়ে আমার তাপিত মনকে আরোগ্য করেছে, এখানকার প্রকৃতিই আমার শেষ ও শ্রেয় আনন্দের আশ্রয়, এখানকার মৃত্তিকাতেই আমার দেহভস্ম মিশে যাবে, আমার প্রাণ এই দেশের আকাশেই মহাব্যোমে বিলীন হবে। যে কবি আমাকে আমার সেই দেশকে চিনিয়েছেন, হাতে ধরে তার গোপন অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছেন, পরম সমাদরে এখানকার মাটির একটি তিলকে আমার নম্র ললাটকে অলংকৃত করে দিয়েছেন তাঁকে আমি কি নিবেদন করব ? শুধু আমার প্রণাম নয়, শ্রদ্ধা নয়, তাঁকে আমি আমার সমগ্র সকৃতজ্ঞ হৃদয় নিবেদন করলাম।

সাত

আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। আমার বক্তৃতামালায় কোন কিছু প্রমাণের চেষ্টা ছিল না, সাহিত্যশিল্পের বিচার এবং বিশ্লেষণও আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এবং সে আমার সাধ্যের বস্তুও নয়। রবীন্দ্রনাথ নামক যে মহাকবি আমাদের জাতির বহু পুণ্যফলে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যার একক প্রভাবে একটি জাতির মধ্যে অতি বৃহৎ তুলনাহীন পরিবর্তন এক কি দুই প্রজন্মের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, তিনি তাঁর দেশের নগরজীবনের বাইরে গ্রামে দেশের যে মূল জীবন প্রবহমান, যা তাঁর কাছে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ অংশ বলে মনে হয়েছে, আমি সেই স্বদেশের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব, ধ্যান ও চিন্তার কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করবার চেষ্টা করেছি। পল্লীর মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি এই তিনে মিলে ত্রিমূর্তি শঙ্করের মতই স্বদেশ তাঁর ধ্যানবস্তু ছিল। মহাকালের যে অক্ষমালায় পল্লীর প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ, সম্পন্ন উচ্চবর্ণ থেকে অন্তেবাসী মানুষ পর্যন্ত একই সম্মানে ও শ্রদ্ধায় বিধৃত, মহাকবি তাঁর জন্মসূত্রে লব্ধ ধাতুগত প্রেম ও জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সেই অক্ষমালাতেই রসের মন্ত্র জপ করেছেন, এবং আত্মিকভাবে নিজেকেও স্বদেশের অসংখ্যের একজন বলে একান্ত শ্রদ্ধা ও নম্রতার সঙ্গে অনুভব করেছেন, এবং সেই অনুভবের মধ্যেই যে তাঁর নরজন্মের চরিতার্থতা নিহিত তাও উপলব্ধি করেছেন। তাই জীবনের অন্তিম পর্বে জীবনব্যাপী সাধনা সমাপনের শেষ লগ্নে নিজের পরিচয় বিবৃত করতে গিয়ে সুগভীর শ্রদ্ধা ও নম্রতার সঙ্গে শেষবার উচ্চারণ করেছিলেন :

সেতারেতে বাঁধিলাম তার
গাহিলাম আরবার
"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরি লোক,
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।"

সেই 'আমাদেরি লোক', আমাদেরই স্বজন রবীন্দ্রনাথকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলাম। জীবিতকালে তিনি আমাদের স্বজন হয়েই আমাদের জন্যই জীবন-সাধনা করেছেন, আজও তিনি আমাদের স্বজন রয়েছেন, ভবিষ্যতেও অনাগত দিনে তিনি 'আমাদেরি লোক' হয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়ে পরম প্রেমের আসনে বিরাজ করবেন।

ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পথরেখা ধরে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায়, কখনও আলোয় কখনও অন্ধকারে আমাদের মাতৃভাষাভাষী ভাবীকালের প্রজন্ম একের পর এক পথ চলবে, আর সেই ভবিষ্যৎ প্রাণযাত্রার মিছিলের যাত্রীদের মুখের ভাষায়, কণ্ঠের গানে, হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের

আবেগ, চিন্তা ও মননে চিরস্থিতি লাভ করে মহাকবিও তাদের চিরসঙ্গী হয়ে থাকবেন। একটু কান পাতলে সেদিনও আজকের মতই মিছিলের কোন এক নবীনের মুখের বাউল সুরের গানে শোনা যাবে, বুঝা যাবে—

তখন কে বলে গো, সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।

সেই কথা, সেই সুর সেদিনও আজকের মত সেদিনের শ্রোতার মনে কাঁপন, চোখে জল, মুখে হাসি টেনে নিয়ে আসবে। যে মাটিতে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি এ ভাষা এ সুর সেই মাটিরই, সেই বাংলা দেশেরই। সেদিন নূতন করে ভবিষ্যতের মানুষ আবার অনুভব করবে চিরকালের অনন্তযৌবন, নবীন বাউলের মত মুখে গান নিয়ে মহাকবি তাদের মিছিলের পুরোভাগে রয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতধর্ম

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে নব-অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছিল। শতাব্দীকাল ধরে চলেছিল আমাদের ইতিহাসে মনীষীর মিছিল; তাঁদের নাম শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারতের জপমালা ছিল। কারণ দেশের একটি অবসাদময় পরাজয়ের মুহূর্তে তাঁরা আমাদের আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে গ্রহণের শক্তি ও প্রেরণা তাঁরা দিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে এই কীর্তির জন্য তাঁরা আমাদের স্মরণীয় এবং বরণীয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা নূতন ভাবধারার কাছে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের লজ্জা হতে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন; তার জন্য তাঁরা আমাদের প্রণম্য। কারণ জীবনের নব নব পুষ্পপল্লবের বিকাশের জন্য নূতন রস আহরণ করতে হলে পুরাতন মূলকাণ্ড-শাখা-প্রশাখাকে বজায় রেখেই তা সম্ভব।

অধুনাকালের ভারতবর্ষে আমাদের নিজস্ব জীবনধারণার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা প্রকাশের কোন বাধা নেই; তথাপি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোক প্রচুর আছেন, ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্যকে জীবনের মধ্যে স্বীকার করে নিতে যাঁরা লজ্জা পান; পরধর্ম-নেশায় যাদের আত্মবিস্মৃতি পরিপূর্ণ হয়েছে। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকেই স্বভাবতই এই মত্ততার প্রকোপ দেশের দিকে দিকে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সেকালে নবীন ভাবধারার মত্ত জোয়ারের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে যাঁরা নবীন ও পুরাতনের সমন্বয় করে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের দিক্ নির্ণয় করেছিলেন, তাঁদের কাজ ছিল দুরূহ। পুরাতনের গোঁড়ামি এবং কালধর্মের ফেনায়িত উচ্ছ্বাস, এই উভয়পক্ষের বিক্ষুব্ধ আঘাত তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে পর্বতের মত ধৈর্য ও চরিত্রবলে। যে মহামানবের গিরিশ্রেণী সেদিনের সন্ধিক্ষণে ভারতধর্মকে রক্ষা করে নূতন গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল রবীন্দ্রনাথের তুঙ্গশীর্ষ তাঁদের সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে।

সাধারণ মানুষের মত মহামানবও যুগ ও পরিবেশের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেন না একথা সত্য। তথাপি শুধু কাল ও পরিবেশের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর প্রতিভার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি না। রান্নার জন্য প্রত্যহ উনুনে যে আগুন জ্বালা হয় এবং আগ্নেয়গিরির জঠরে যে আগুন জ্বলে, এই দুইয়ের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য না থাকলেও কারণের যে ভেদ আছে একজন সাধারণ প্রতিভাধরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

ভেদ তেমনি। উনুনে আগুন জ্বলে নৈমিত্তিক কারণে, কিন্তু আগ্নেয় শৈলের উদ্ভব নিত্য কারণে, সৃষ্টির আদিভূত কারণের সঙ্গে তার যোগাযোগ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কর্ম-জীবনের বিবিধ প্রচেষ্টা ও কীর্তির পর্যালোচনা করে আমার মনে হয়েছে যে, কাল ও পরিবেশের ফলে প্রকাশের রূপভেদ ঘটলেও, রবীন্দ্রপ্রতিভার শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বিশ্বের নিয়ন্তা একটি ধ্রুব এবং শিবময় সত্তায় প্রতি অচলপ্রতিষ্ঠ বিশ্বাসে। তিনি যা করেছেন এবং লিখেছেন, আনন্দ ও বেদনা, হতাশা ও উৎসাহ, যা কিছু অনুভব করেছেন এই সত্তার কাছে তার সব কিছু নিবেদন করে আবার তাকে গ্রহণ করেছেন তাঁর প্রসাদ বলে। তাঁর এই নিবেদন ও প্রসাদ গ্রহণের প্রধান বাহন ছিল তাঁর গান। তাই তাঁর গান তাঁর সৃষ্টিশক্তির অন্তরতম সামগ্রী, যার সুর দিয়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতির নাগালের বাইরে সেই ধ্রুব সত্তার চরণস্পর্শ করে আসেন। তিনি ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম যাই হোন, বিচিত্র তাঁর প্রকাশ, অসীম তাঁর ঐশ্বর্য, সেই প্রকাশ-বৈচিত্র্য তিনি আমাদের মত ক্ষুদ্র ভঙ্গুর আধারে কণায় কণায় বেঁটে ভোগ করে আনন্দ পান। ত্রিভুবনেশ্বরের এই বিচিত্র লীলার আধার হিসাবেই কবি চিরকাল নিজেকে গণ্য করেছেন। তিনি যখন কবি, যখন সাহিত্যিক, যখন সমাজ-সংস্কারক অথবা শিক্ষাব্রতী অথবা দেশকর্মী, সর্বরূপেই তিনি সেই অখণ্ড-আনন্দের কণা বলেই নিজেকে বিবেচনা করেছেন। তাই জীবনের কোন অবস্থাতেই, কর্মশালার কোন ক্ষেত্রেই কবির কণ্ঠে সেই পরমদেবতার আহ্বান স্তব্ধ হয়নি। জীবন যখন রসসিক্ত মনে হয়েছে তখন করুণাধারায় তাঁর আবাহন, কর্মের ঝড়ে তিনি শান্তি, সংকীর্ণ-আত্ম-পরিতোষের তিনি দর্পহারা রাজরাজেশ্বর, অন্যায় বাসনার অন্ধকারে তিনি রুদ্র বজ্রালোক।

তাঁর সাহিত্য ও কাব্য বৈচিত্র্যে ও পরিমাণে বিপুল। তাই আলাদা আলাদা করে বিবেচনা করলে তাঁর সব রচনার মধ্যেই প্রকট বা স্পষ্টভাবে তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা পাওয়া যাবে না। কারণ তাহলে তাঁর সাহিত্যকীর্তির পরিধি শুধু ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মাবলম্বী কাব্যে ও সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সত্য, শিব ও সুন্দর সত্তার আনন্দ-যজ্ঞে বাঁশী বাজানোর ভার পেয়েছিলেন, তাঁর যজ্ঞশালার পরিধি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই জীবনের যে অংশকে অবলম্বন করেই তিনি কাব্য অথবা সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকুন, তা সেই যজ্ঞেশ্বরের তৃপ্তির জন্য। একটি গানে, একটি প্রশ্নে তিনি সেই কথা বলে গেছেন—

এই কি তোমার খুশি
আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা ?

এই খুশির আবদার রাখতে ব্যবহারিক অর্থে সারাজীবন যদি বরবাদ হয় তাতে ক্ষতি নেই। তাই ঐ গানেই কবি বলেছেন :

রাতের বাসা হয়নি বাঁধা দিনের কাজে ত্রুটি
বিনাকাজের সেবার মাঝে পাইনে আমি ছুটি।
শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে
অশান্তি যে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা—
এই কি তোমার খুশি আমায় তাই পরালে মালা,
সুরের গন্ধ-ঢালা।

শুধু কাব্য অথবা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের নানাবিধ কর্মে মানুষ যে এই খুশীর নির্দেশই বহন করে চলে, কবির জীবনে এই বিশ্বাস চিরদিন অটুট ছিল। তাঁর কাব্যে, গানে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে এবং বিচিত্র রচনায় এই বিশ্বাসের অজস্র নজীর ছড়িয়ে আছে।

সচারচর দেখা যায় জীবনের সূর্য অস্তাচলের দিকে চলে পড়লেই বিশ্বনিয়ন্তার কথা মানুষের মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ চৈতন্য তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে আবাল্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। এই প্রসঙ্গে নূতন ব্রাহ্মণ-বালক রবীন্দ্রনাথের গায়ত্রী-মন্ত্র অভ্যাসের কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। 'জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন, "আমার বেশ মনে আছে আমি "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম, কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন…" এবং এই প্রসঙ্গে একটু পরে, "তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে · আমাদের পড়িবার ঘরে শান-বাঁধানো মেঝের এককোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মত এমন কোন একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোন যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পেঁছায় না।" কবির অন্তরের অন্তঃপুরে সেই শিশুকালে বিশ্বের মূলীভূত কারণের সঙ্গে আদান-প্রদানের যে কাজ শুরু হয়েছিল, সারাজীবন তার বিরাম ঘটে নি · সেই সেতু-বন্ধনের পথে কবি তাঁকে আবাহন করেছেন ঃ

এসো দুঃখে সুখে এসো মর্মে—
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে—
এসো সকল কর্ম অবসানে—
এসো নব নব রূপে এসো প্রাণে।

কবির জীবনের বিবিধ চিন্তা ও কর্মের মধ্যে এই আহূত দেবতার পুণ্য দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই দিব্যপ্রভাবে তাঁর চিন্তা কখনো সত্য এবং মঙ্গলের পথ হতে ভ্রষ্ট হয়নি। যে যুগে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল, তখন দুই বিপরীত মহাকর্ষের দোটানায় পড়ে শিক্ষিত সমাজে সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিদের সঙ্গীন অবস্থা—একদিকে গোঁড়া রক্ষণশীল মতবাদ যা চাইছিল আবার নিয়ম, অনুষ্ঠান ও সংকীর্ণ সংস্কারের নাগপাশে চলৎশক্তিহীন স্থানু ঈশ্বরের সঙ্গে সমাজকে একসঙ্গে বাঁধতে—অন্যদিকে ছিল উগ্র প্রগতিপন্থী যারা দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের বাঁধন ছিঁড়ে কাটা ঘুঁড়ির মত পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার নানাবিধ দমকা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে এক অভাবনীয় নব ইংলণ্ডে উত্তীর্ণ হবার স্বপ্নে বিভোর। অসত্য এবং অমঙ্গলের পাল্লা উভয়-পক্ষেই সমান ভারী। কাজেই রবীন্দ্রনাথ কোন দলেই নাম লেখালেন না। এক পক্ষের উদ্দেশে তিনি বলতেন, "শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে ভারতবর্ষে আমরা নানা জাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিক্যাল বল লাভ করা। এমন করিয়া যে জিনিসটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দাস করিয়া দেখিতেছি।··ইহাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।" রক্ষণশীলদের সম্বন্ধে তিনি বললেন, "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" কবির নিজের জীবন-সাধনার প্রকৃতিও বিবেকানন্দেরই অনুরূপ ছিল। তাঁর কবিসত্তা কর্মীসত্তা এই একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল। হাজার অভিজ্ঞতা

ও হাজার অনুভূতির লীলাচাপল্যের দোলায় তাঁর কল্পনা হাজার গীতের বর্ণাঢ্য মহিমা বিস্তার করেছিল এবং তার মধ্যে বিশ্বরূপের অখণ্ড মহাকাব্যের আস্বাদ পেয়েছিল। তাঁর কর্মজীবনও তেমনি জাতি-ধর্ম-সংস্কারের বাধাকে অতিক্রম করে অখণ্ড মানবতার সাধনায় নিয়োজিত ছিল।

কবি বিশ্বাস করতেন যে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের সমন্বয় সম্ভব করবার সাধনায় ভারতবর্ষের একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। ভারতের এই মহান ভূমিকার যোগ্যতা তার ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। ইউরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল কর্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর।"

ইউরোপীয় নেশন-পন্থী সভ্যতার পরিণাম প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পাশব তাণ্ডবের মধ্যে। সেই যুদ্ধের সন্ধিপত্রের মধ্যেই ত্রিকালদর্শী ঋষির চোখ দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আগামী দিনের ভয়াল পরিণতি এবং জীবনের সন্ধ্যাকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংঘাত তাঁর ভবিষ্যৎদৃষ্টির সত্যতা প্রমাণ করেছিল। এই সভ্যতার মধ্যে যে নৈতিক দুর্বলতা আছে, যে দুর্বলতা দুরারোগ্য ব্যাধির মত এই তেজস্বী সভ্যতার সার্থক পরিণতিকে বার বার ব্যাহত করছে, কবি তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "যে ধর্মনীতি ব্যক্তিবিশেষের নিকট বরণীয় তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জনীয়, একথা এক প্রকার সর্বজন গ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেইজন্য ফরাসী, ইংরেজ, জর্মান, রুশ ইহারা পরস্পরকে কপট ভণ্ড প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গালি দিতেছে।" প্রায় ষাট বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাধির নিদান নির্ণয় করেছিলেন। তারপর এই রোগ ইউরোপ এবং আমেরিকা অতিক্রম করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমরাও স্বধর্মচ্যুত হয়ে পরম গৌরবে এই বিশ্বরোগের অংশীদার হয়েছি। যদিও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগে আমাদের ধর্ম মোটামুটি বজায় আছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই রোগলক্ষণ তীব্রভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার যা ত্রুটি, নীতির পথ থেকে যত কিছু বিচ্যুতি তা সমগ্রভাবে কবির চোখে পড়েছিল। তবু এই সভ্যতার মধ্যে যা শ্রেয়, যা গ্রাহ্য, যা বরণীয় সে সম্বন্ধে স্বীকৃতি তিনি অকৃপণভাবেই দিয়েছেন। শুধু কাব্যে ও সাহিত্যেই নয়, তাঁর বিস্তৃত কর্মজীবনে অকুণ্ঠ প্রয়োগের মধ্যে সেই স্বীকৃতির অজস্র প্রমাণ ছড়ানো আছে। পাশ্চাত্ত্য জড়-বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "তিনি তাঁর সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে; ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম; একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম আর একদিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম; এই দুইয়ের যোগে তুমি বড় হও; জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক্—এ ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই। এই বিধিদত্ত স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে

পারবে।" আরো অনেক পরে জাপান যাত্রার সময় বিজ্ঞানের জগতে মানুষের দুঃসাহসিক অভিযানকে কৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীমতীর অভিসারের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, "মানুষের মধ্যে যে সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগোচ্ছে—ভয়ের ভেতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভেতর থেকে সম্পদে।" কিন্তু শুধু বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধিকে তিনি কখনো পরমার্থ বলে মনে করেন নি। তিনি দেখেছেন আমেরিকার ঐশ্বর্য, তার শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। তবু সেদিন ভ্রূকুটি-কুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে—ততঃ কিম? বৈষয়িক শক্তিবৃদ্ধির মত্ততায় অন্তরের সত্য যেখানে অবহেলিত, সেখানে শ্রেয় যে নেই কবি তা বুঝেছিলেন। ভোগের সামগ্রীর যোগ্য হতে হলে প্রেম ও সংযমের যে প্রয়োজন তাই বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন, সেই হল প্রকৃত মিলন।"

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এই মিলনের বৈরাগী শিব যার দৃষ্টি অন্তরে, হৃদয়ে প্রেম কিন্তু বহিরঙ্গের প্রতি নিরুত্তাপ ঔদাসীন্য। ইউরোপীয় ঐশ্বর্যময়ী সংস্কৃতি—অন্নপূর্ণা, কিন্তু বৈরাগী শিবকে চরণে দলিত করে ধ্বংসাত্মিকা কালী। কিন্তু মিলনের আগ্রহে শিব যদি বৈরাগ্য বিসর্জন দেয়, সংযম হারায়, তাহলে সেই মিলন ব্যর্থ হবে। কাজেই ভারতকে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেই মানব-সমন্বয় সাধনা করতে হবে। কবির উক্তি এখানে সুস্পষ্ট, "আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে সবলভাবে সচলভাবে সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।" এই বাণী অকুণ্ঠ দ্বিধাহীন চিত্তে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার অমোঘ আহ্বান। কবি এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে বিধাতার উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন, আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে; আমাদের দেশের তাপসেরা তপস্যার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহা নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।" কোন ধর্ম ভারত বিশ্বে প্রচার করবে, কোন কর্ম সমাপন করবে, তার ইঙ্গিতও কবি দিয়েছেন, "বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, ইহাই ভারতের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"…"আমরা ভারতের বিধিনির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব।"

অর্ধশতাব্দী পূর্বে রচিত এই প্রবন্ধ যেন আজও সত্যের দ্যুতিতে ঝলমল, যেন ইদানীং কালের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর শতাব্দীকাল পার হয়ে আরও কয়েক বৎসর পার হয়ে গেল; কিন্তু তখনও যেমন ছিল আজও তেমনি আমাদের দেশে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উপহাস ও অবমাননা করবার লোকের অভাব নেই। পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ করতে চান। রবীন্দ্রনাথ ষাট বৎসর আগে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পরিণাম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তা তাঁদের পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। দেখবেন আজকের দিনের জন্যও কবির উক্তির উপযোগিতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "কী সন্দেহ ও কী আতঙ্কের সহিত ইউরোপের প্রত্যেক রাজশক্তি পরস্পরের প্রতি ক্রূর কটাক্ষপাত করিতেছে। রাজমন্ত্রিগণ টিপিয়া টিপিয়া মৃত্যুবাণ ঢালিতেছে। রণতরীসকল মৃত্যুবাণে পরিপূর্ণ হইয়া পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে যমদৌত্যে বাহির হইয়াছে। আফ্রিকায় ইউরোপের ক্ষুধিত লুব্ধকগণ ধীরে ধীরে এক এক পা বাড়াইয়া একটা থাবায় মাটি আক্রমণ করিতেছে এবং আর একটা থাবা সম্মুখের লোলুপ অভ্যাগতের প্রতি উদ্যত করিতেছে।" ষাট বৎসর পূর্বের সঙ্গে তফাৎ এইমাত্র যে, লুব্ধকগণ এখন আর শুধু পাশ্চাত্ত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রাচ্য ভূখণ্ডেও

এই মহালোভের আদর্শ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই লোভের বিকৃতির মধ্যে ভারতকে আত্ম-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে নিজের জন্য। "প্রবৃত্তির প্রবলতা ও প্রভুত্বের মমতা, স্বার্থের উত্তেজনা কোন কালেই শান্তি ও পরিপূর্ণতায় লইয়া যাইতে পারে না, তাহার একটা প্রচণ্ড সংঘাত, একটা ভীষণ রক্তাক্ত পরিণাম আছেই। অতএব ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে চরম আদর্শ বিবেচনাপূর্বক তদ্দ্বারা ভারতবর্ষকে মাপিয়া খাটো করিবার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু এই খাটো করার চেষ্টার আজও বিরাম নাই। আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটি বিশেষ অংশ ভারতবর্ষের প্রতি তাঁদের সুস্পষ্ট অবজ্ঞাকে গোপন করার চেষ্টাও করেন না। তাঁদের সমগোত্রীয়েরা সেকালেও ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন, "দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষা-চঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে এখনও ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই।...ইংরেজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটহ তালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না—তাহা আমাদের নদীতীরে রৌদ্র-বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে।...আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যা বাক্য, যাহা স্বরচিত, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা এক-মাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে...যখন ঝড়ের গর্জনে অতি বিশুদ্ধ ইংরাজী বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ওই সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ ঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে।" এইসব অবিশ্বাসী আত্মনিন্দাপরায়ণ, পরানু-চিকীর্ষুদের ব্যবহার অবিনশ্বর ভারতধর্মের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, সেই ধর্ম শেষে জয়ী হবেই স্বদেশ এবং বিদেশে। তারই অমোঘ আশ্বাস কবির বাণীতে ধ্বনিত হয়েছে: "আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, বর্ষে বর্ষে 'মিলি মিলি যাওব সাগর লহরী সমানা।' তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখনও সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে, "পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।"

তিনি কহিবেন, "ওঁ ইতি ব্রহ্ম।"

তিনি কহিবেন, "ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।"

তিনি কহিবেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন!"